ইসলামী হিজাব (পর্দা)

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মূর্তাজা মোতাহারী

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা

ইসলামী হিজাব (পর্দা)

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তজা মোতাহারী

প্রকাশনায়ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
বাড়ী নং-৫৪, সড়ক নং ৮/এ, ধানমন্ডি আ/এ
ঢাকা-১২০৯, ফোনঃ ৩২৯৩৬৩, ঢাকা।

প্রথম বাংলা সংস্করণঃ ১১ ফেব্রুয়ারী '৯০ ইং; ১৫ রজব, ১৪১০ হিঃ ২৯ মাঘ, '৯৬ বাং

প্রচ্ছদঃ আরিফুররহমান

মুদ্রণঃ চৌকস ঢাকা। ফোনঃ ৪১৪৩৯৩

ISLAMI HIJAB (PARDA)

AUTHOR: MARTYRE PROFESSOR AYATULLAH MURTAZA MUTAHHARI

PUBLISHED BY. THE CULTURAL CENTRE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, DHAKA.

HOUSE NO. 54, ROAD NO. 8/A, DHANMONDI R/A DHAKA-1209, PHONE: 329363

প্রকাশকের কথা

ইসলামী বিধান অনুযায়ী মহিলাদের পর্দা মেনে চলা একটা অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় রীতি হিসেবে বিবেচিত। নারী সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি হতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্রের অধিকারী। ইসলাম নারীদের সমাজের অর্ধাঙ্গ হিসেবে মূল্যায়ন করে। ইসলাম নারীদেরও পুরুষদের অনুরূপ সামাজিক ও মানবীয় মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়।

পশ্চিমা সমাজে নারীদের "যৌনকামনার সামগ্রী" হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তারা মনে করে নারী কেবল সম্ভোগের বস্তু। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন কি বিবাহের সাথেও তারা যৌন কামনার বিষয়াদিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

পাশ্চাত্যের এ ধরনের চিন্তার বাস্তব প্রতিফলন হিসেবেই আজকের পাশ্চাত্য সমাজের প্রচার মাধ্যম থেকে শুরু করে রাস্তা-ঘাট, দোকান পাট তথা সর্বক্ষেত্রে নারীদের পণ্য সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আক্ষেপের বিষয় হলো এসব কর্মক্রিয়ার ফলে পাশ্চাত্য নারীসমাজ নিজেদের অজান্তেই একটা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ ইসলাম নারীদের সামাজিক কাজ-কর্মের জন্য বিশাল সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়ে একদিকে তাদের সুনির্দিষ্ট অধিকার যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছে। অপরদিকে তেমনি যৌনকর্মকান্ডকেও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করেছে। ইসলাম নারীদের জন্যে সামাজিক জীবনযাপনের এক সার্বজনীন আইন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং হিজাব বা পর্দাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

এ বইটি মূলতঃ শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মোতাহারী (রহঃ)-এর হিজাব সংক্রান্ত কয়েকটি ভাষণের একটি সংকলন মাত্র-যা পাঠকদের বিশেষতঃ মহিলা পাঠিকাদের হিজাব সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে।

বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের বিশেষ ভাবে বাংলাদেশী ভাই-বোনদের নিকট ইসলামী অনুশাসনের এ বিষয়টি সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হল।

আমরা আশা করি মানব সমাজে নারীজাতি যথাযথ মর্যাদা লাভ করবে।

কালচারাল এটাচী
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইসলামী বিপ্লবের গৌরবোজ্জ্বল
বিজয়ের একাদশ বার্ষিকী
উপলক্ষে প্রকাশিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

হিজাব শব্দের অর্থ ৯

হিজাবের প্রকৃত রূপ ১২

১। মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তি ১৪

২। পরিবারের ভিত্তি মজবুত করা ১৮

৩। সামাজিক স্থিতিশীলতা ২১

প্রথম অধ্যায় ঃ হিজাবের বিকাশ লাভের কারণ

প্রথম অংশ

দার্শনিক কারণ ২৩

সামাজিক কারণ ২৪

৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ হিজাব বিকাশ লাভের কারণ

দ্বিতীয় অংশ

অর্থনৈতিক কারণ ৩৩

নৈতিক কারণ ৩৪

মনস্তাত্ত্বিক কারণ ৩৭

৪০

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামী হিজাব

প্রথম অংশ

হিজাব নারীকে মর্যাদা দান করে ৪৬

কারো বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ ৪৯

দৃষ্টি অবনমিত রাখার নির্দেশ ৫৩

"গোপন অঙ্গসমূহের" হেফাজত করা ৫৫

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ইসলামী হিজাব–দ্বিতীয় অংশ

সাজসজ্জা প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা ৫৭

ব্যতিক্রম সমূহ ৫৭

মেয়েদের দিকে পুরুষের তাকানো কি জায়েজ ৬০

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ইসলামী হিজাব
তৃতীয় অংশ
হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ৬৬
মালিকানাভূক্তদের সাথে সম্পর্কিত বিষয় ৬৭
গায়ের মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকের কণ্ঠের আওয়াজ শোনা ৬৯
করমর্দন ৭০
ধর্মীয় ফতোয়া প্রসঙ্গে ৭০
মুসলমানদের রীতিনীতি ৭২
ধর্মীয় বিধান ৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ইসলামী হিজাব
চতুর্থ অংশ
অনুমোদনযোগ্য সুবিধা ও অসুবিধা ৮২
হাদীস এবং বর্ণনাসমূহ ৮৬
পাণি প্রার্থীর ব্যাপারে ব্যতিক্রম ৮৭
পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত অন্যান্য ব্যতিক্রমসমূহ ৮৮
২৪ঃ৩১ আয়াতের সিদ্ধান্ত ৯১

সপ্তম অধ্যায়ঃ ইসলামী হিজাব–পঞ্চম অংশ
অনুমতি প্রার্থনার তিনটি সময় ৯৩
এমন সব মহিলারা যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে ৯৭
নবী করিম (দঃ) এর স্ত্রীদের বিষয় ৯৮
হিজাব সংক্রান্ত আয়াত ৯৯
উপসংহারঃ সভা ও সমাবেশে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১০২

ভূমিকা

হিজাব শব্দের অর্থ

মেয়েদের 'হিজাব' বা শালীন পোষাক সম্পর্কিত একটা বিশেষ ইসলামী দর্শনে আমরা বিশ্বাস করি যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী বিন্যাস করে। বিশ্লেষণে দেখা যায় এটা ইসলামী 'হিজাব' এর ভিত্তি।

আলোচনা শুরুর পূর্বে 'হিজাব' শব্দটি যা আমাদের যুগে একজন স্ত্রীলোকের আবরণকে বোঝায় তার প্রকৃত অর্থ জানা দরকার। এ শব্দটি দ্বারা আবরণ বোঝায়, কারণ এটা আচ্ছাদন বা আবৃত করার মাধ্যমকে নির্দেশ করে। সম্ভবতঃ এটা বলা যায় যে, শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়ে সব আবরণই "হিজাব" নয়। 'হিজাব' বলতে যে আবরণ বোঝানো হয়েছে, তা'হলো পর্দার আড়ালে অবস্থান করা। পবিত্র কোরআনে হযরত সোলায়মান (আঃ) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ''—যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য আচ্ছাদিত (বিল–হিজাব) হলো" (৩৮ ঃ ৩২)। মানুষের শরীরের মধ্যচ্ছদা যা হৃৎপিন্ড থেকে পাকস্থলীকে আলাদা করে রাখে তাকেও 'হিজাব' বলা হয়।

হযরত আলী (আঃ) মালিক আশতারকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন "—বেশী দিন তোমার অধীনস্থদের থেকে বিচ্ছিন্ন (হিজাব) থেকো না, কারণ তাদের থেকে শাসক বেশী দিন বিচ্ছিন্ন থাকা এক ধরনের অবরোধ এবং এর ফলে বাস্তবে কি ঘটছে তা অজানা থেকে যায়। বিচ্ছিন্নতার ফলে শাসকরা অধীনস্থদের সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।" [২]

ইবনে খালদুন তাঁর 'মোকাদ্দিমা' গ্রন্থে বলেছেন ''শাসনামলের শুরুতে সরকারগুলো জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করে না, কিন্তু আস্তে আস্তে শাসক এবং জনগণের দূরত্ব বাড়তে থাকে যা থেকে অবশেষে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।"[৩] ইবনে খালদুন 'হিজাব' শব্দটি পর্দা এবং বিচ্ছিন্নতা অর্থে ব্যবহার করেছেন, আবরণ হিসেবে নয়।

ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞরা আবরণ বোঝাতে 'হিজাব' শব্দটির পরিবর্তে 'সতর' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করেন। ধর্মীয় আইনবিদ বা ফকিহগন নামাজ অধ্যায় বা

বিবাহ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তারা 'হিজাব' এর পরিবর্তে 'সতর' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

যদি শব্দটা পরিবর্তিত না হতো এবং আমরা আবরণ বা 'সতর' শব্দটিই ব্যবহার করে যেতাম তা হলেই বরং ভালো ছিলো, কারণ আমরা আগেই বলেছি, হিজাব শব্দটির প্রচলিত অর্থ হচ্ছে আচ্ছাদন। যদি এটাকে আবরণ বোঝাতে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে এটা মেয়েদের পর্দার আড়ালে থাকা বোঝায়। এ জিনিসটাই অনেকের মনে এ ধারণা দিয়েছে যে, ইসলাম চায় মেয়েরা গৃহবন্দী হয়ে পর্দার আড়ালে থাকুক। মেয়েদের পর্দা করার অর্থ এই নয় যে, তারা কখনো ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। ইসলামে মেয়েদের জন্য পর্দাপ্রথা থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে। ইসলাম মেয়েদের আটক করে রাখতে চায় না। এ ধরণের চিন্তা প্রাক্ ইসলামী যুগের ইরান ও ভারতবর্ষসহ কতিপয় দেশে আমারা দেখতে পাই। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের চিন্তার সুযোগ নেই। ইসলামে মেয়েদের জন্য হিজাব বা পর্দাপ্রথা থাকার পেছনে যে দর্শনটি কাজ করছে, তাহলো ধর্মীয় আইন অনুযায়ী যাদের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ নয় (অমাহ্‌রাম) এমন সব পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে একজন নারী তার শরীর ঢেকে রাখবে এবং সে তার অংগ প্রদর্শন করবে না। পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে এবং ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞদের রায় এগুলোকে সুদৃঢ় করেছে। আমরা কোরআন এবং সুন্নাহ্‌কে উৎস ধরে নিয়ে ঢেকে রাখার সীমা সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রাসংগিক আয়াতগুলোতে 'হিজাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। এ বিষয় যেসব আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সূরা নূর অথবা সূরা আহজাব সেগুলোতে হিজাব শব্দের ব্যবহার ছাড়াই ঢেকে রাখার সীমানা ও নারী পুরুষের মেলামেশা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে আয়াতে হিজাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর বিবিগণকে বোঝানো হয়েছে।

আমরা জানি, পবিত্র কোরআনে মহানবী (দঃ)-এর স্ত্রীগণ সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রদান করা হয়েছে। যে আয়াতে প্রথম তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, তা এভাবে শুরু হয়েছে, ''হে নবীর স্ত্রীগণ! আপনারা অন্য স্ত্রীলোকের মত নন---'' (৩৩ঃ৩২)।[৪] ইসলাম রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর স্ত্রীগণকে এতই শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে যে, তাঁরা মহানবী (দঃ) জীবদ্দশাতে এবং তাঁর ওফাতের পরে মূলতঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে গৃহে অবস্থান করতেন। পবিত্র কোরআনে মহানবী (দঃ)-এর স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে সরাসরি বলা হয়েছে যে, ''তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান

করবে।'' (৩৩ঃ৩৩)।[৫] ইসলাম চাচ্ছিলো যে, ''মোমিনদের জননীসদৃশ'' রাসূলুল্লাহ (দঃ)–এর স্ত্রীগণ কোনো স্বার্থপর ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে তাঁদের সম্মান এবং মর্যাদা নিয়ে যথার্থভাবে বেঁচে থাকুন।

আমার মনে হয়, এ কারণেই রাসূলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদের আবার বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কেননা রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর পর অপর কোন স্বামী হয়ত তাদের মর্যাদা ও সম্মানকে অপব্যবহার করতে পারে। তাই এত জোর দিয়ে ও কঠোরতার সাথে রাসুলের (দঃ) স্ত্রীদের ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সে যাই হোক, যে আয়াতে হিজাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাহলো ''––এবং তাঁর স্ত্রীগণ থেকে কিছু চাইবার হলে পর্দার (হিজাব) অন্তরাল থেকে চাও।'' (৩৩ঃ৫৩)[৬] ইতিহাস এবং ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী যখনই ''হিজাবের আয়াতের'' কথা উল্লেখিত হয় যেমন ''হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের অবস্থা ছিল অন্য রকম'' অথবা "হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পরে অবস্থা ছিল এরকম'' তখন সেই আয়াতকেই বোঝানো হয় যা রাসূলুল্লাহ (দঃ)–এর স্ত্রীগণ সম্পর্কিত এবং সূরা নূরের আয়াতসমূহ নয়– যেখানে বলা হয়েছে, ''বিশ্বাসীদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তারা যেন লজ্জাস্থানসমূহ হেফাজত করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যে, তারা কি করছে এবং বিশ্বাসী স্ত্রীলোকগণকে বলুন যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে,'' (২৪ঃ৩০–৩১)[৭] অথবা সূরা আহযাবের আয়াতসমূহে যেখানে বলা হয়েছে, ''হে নবী! আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মোমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়, এর ফলে তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাশীল এবং পরম দয়ালু।'(৩৩ঃ৫৯)[৯]

আজকের যুগে কিন্তু এটা একটা প্রশ্ন যে হিজাবের পরিবর্তে ফকিহদের ব্যবহৃত 'সতর' শব্দটির প্রচলন কেন হল না? এর কারণ আসলে সুস্পষ্ট নয়। হতে পারে তারা হয়তো ইসলামী হিজাবকে অন্যান্য দেশে প্রচলিত হিজাবের সাতে মিলিয়ে দেখেছেন। আমরা পরে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করবো।

হিজাবের প্রকৃত রূপ

সত্য কথা হচ্ছে আবরণসহ অথবা আবরণহীন অবস্থায় মেয়েদের ঘরের বাইরে বের হওয়া ঠিক অথবা বেঠিকের সাথে আবরন অথবা নতুন পরিভাষা 'হিজাব' সংশ্লিষ্ট নয়। আসল ব্যাপার হল, মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের প্রয়োজনের সম্পর্কটা একটা অবাধ মেলামেশায় রূপ নিতে পারে কিনা? একজন পুরুষের কি এ অধিকার থাকা উচিত যে সে বৈধ সীমানায় অবস্থান করে সকল মেয়ে লোকের সাথে সকলস্থানে গিয়ে তার প্রয়োজনমিটাবে?

ইসলামের এই প্রসঙ্গে উত্তর হচ্ছে 'না-সূচক।' বৈবাহিক বিধানে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্বের কথা রয়েছে। এভাবে যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এর আওতায় থেকে একজন পুরুষ শুধুমাত্র বৈধ স্ত্রীদের সাথেই তার যৌন আকাঙক্ষা মিটানোর অধিকার রাখে। সমস্যার মূল দিক বিচারে পুরুষের জন্য তাদের বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একথা ঠিক যে আপাততঃ দৃষ্টিতে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, 'তাহলে একজন নারী কি করবে?' 'সে তার ঘর থেকে কি আবরণসহ বেরুবে না আবরণহীন অবস্থায়?' প্রশ্নটি উঠেছে মহিলাদের সম্পর্কে এবং তা মাঝে মাঝে হৃদয়বিদারক ভাষায় করা হয়। 'মহিলাদের জন্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা উত্তম, না হিজাবে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া উত্তম?' কিন্তু প্রশ্নটির গভীরে অন্য কথা রয়েছে। অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা নাই হোক, একজন পুরুষ কি নারীদের নিকট থেকে ইচ্ছেমত যৌনসুখ লাভ করার অধিকার রাখে? আসলে এর ফলে নারীরা নয়, লাভবান হচ্ছে পুরুষই। অথবা একজন নারীর চেয়ে পুরুষ লাভবান হচ্ছে বেশী। যেমন উইল ডুরান্ট লিখেছেন, ''মিনি স্কার্ট শুধুমাত্র মহিলা দরজি ছাড়া আর সকলের জন্যেই একটি আশীর্বাদ।'' সুতরাং প্রশ্নটার গভীরে রয়েছে যে বিষয়টা তা' হলো যৌনতৃপ্তির সন্ধান পরিবারের মধ্যে আইনসংগত স্ত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি পরিবারের বাইরে সমাজের মধ্যেও যৌনতৃপ্তি সন্ধানের স্বাধীনতা থাকবে? ইসলাম প্রথম তত্ত্বটিকে সমর্থন করে। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা অনুযায়ী যৌন কামনা পরিবারের গন্ডীর মধ্যে নিজেদের আইনসংগত স্ত্রীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে তা সমাজের সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এটা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঐক্য স্থাপন করে। সামাজিক ক্ষেত্রে এটা তখন সামাজিক

কর্মকান্ডের জন্য উদ্যম সংরক্ষণ করে এবং মেয়েরা পুরুষের চোখে অধিক সম্মানজনক স্থান লাভ করে।

ইসলামী আবরণের দর্শন অনেকগুলো জিনিসের ওপর নির্ভর করে যার কিছু মনস্তাত্ত্বিক, কিছু পারিবারিক, কিছু সামাজিক এবং কিছু হচ্ছে মেয়েদের মর্যাদা বাড়ানো এবং তাদের অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করা সংক্রান্ত।

ইসলামে 'হিজাব'–এর মূল নিহিত রয়েছে অধিকতর ব্যাপক এবং মৌলিক বিষয়ে। ইসলাম পারিবারিক ও বৈবাহিক পরিবেশের মধ্যে সবধরনের যৌন আনন্দকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, সীমাবদ্ধ রাখতে চায় বিবাহের আওতায়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনার জায়গা হচ্ছে সমাজ। বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজে কাজ ও যৌন আনন্দকে এক করে ফেলা হয়েছে। ইসলাম এ দুটো পরিবেশকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখেছে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তি

নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন সীমানা না থাকলে অথবা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় যৌনকামনা ও উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তা অদমনীয় ও অপূরনীয় হয়ে দাঁড়ায়। যৌন প্রবৃত্তি হচ্ছে একটা শক্তিশালী ও গভীরভাবে প্রোথিত একটি সহজাত প্রবৃত্তি যাকে অতল সমুদ্রের সাথে তুলনা করা যায়। অনেকে মনে করে যৌণক্ষুধা পূরণ করলেই অবদমিত হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। এভাবে উদ্ধত মনোভাব আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এটা হচ্ছে আগুনের মতে। আগুনে যত ইন্ধন দেয়া যায়, ততই এর শিখা বাড়তে থাকে। একথা বুঝতে হলে দুটি বিষয় অনুধাবন করতেহবে।

প্রথমতঃ ইতিহাসে উল্লেখ আছে, যাদের সম্পদের লোভ ছিল তারা সব সময় নিজেদের সম্পদ আরো বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করেছে। যত বেশী সম্পদের মালিক তারা হয়েছে ততই আরো বেশী পাওয়ার জন্যে তারা লোভ করেছে। ইতিহাসে ইন্দ্রিয়লিপ্সু লোকদের কথাও আছে। বহু সুন্দরী মহিলা তাদের অধিকারে থাকার পরও তারা কখনো তৃপ্ত হয়নি। সত্যি কথা হচ্ছে, যাদের হারেম ছিল এবং যাদের বহুসংখ্যক রমণীকে নিজ অধিকারে রাখার ক্ষমতা ছিল, তাদের সকলের অবস্থাই ছিল এ রকম।

সাসানীয় শাসকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্রিসেনসেন লিখেন, তাক-ই-বুস্তানে পাথরে খোদাই করা যেসব নারী আমরা দেখতে পাই সেগুলো খসরু পারভিজের হারেমের ৩০০০ জন স্ত্রীলোকের কয়েকজন মাত্র। বাদশাহর যৌনলিপ্সা কখনো তৃপ্ত হয়নি। তার সামনে সুন্দরী মেয়ে, বিধবা অথবা সন্তানসহ মহিলা যখনই হাজির করা হত তখনই তিনি তাদের হারেমে পাঠাতে নির্দেশ দিতেন। তিনি যখন তার হারেমের জন্যে রমণী চাইতেন তখন কি ধরনের নিখুঁত সুন্দরী তার পছন্দ তা তার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট চিঠি লিখে তিনি জানাতেন। তারপর প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তার বর্ণনা অনুযায়ী রমণী পেলেই তার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।[১০]

ইতিহাসে এ ধরনের কাহিনী অসংখ্য রয়েছে। আজকাল যৌনলিপ্সা মেটাতে হারেম বানানোর প্রচলন নেই। এখন তা অন্যভাবে রয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে, বর্তমানে এজন্যে কারো খসরু পারভিজ অথবা হারুনুর রশীদের মত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা থাকার প্রয়োজন হয় না। 'আধুনিক সংস্কৃতির কল্যাণে পারভিজ বা হারুনুর রশীদের

চেয়ে হাজার ভাগের একভাগ সুযোগ-সুবিধা থাকলেই একজন মানুষের পক্ষে বহু রমণীকে উপভোগ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ মহিলাদের উদ্দেশ্যে গান অথবা প্রেমের কবিতা লেখার আকাঙ্খা কোন প্রকার অমানবিকবোধ থেকে সৃষ্টি হয় বলে কি আপনারা মনে করেন? বিশ্বসাহিত্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেমের কবিতা। এ সকল সাহিত্যে পুরুষ তার প্রেমিকার গুণকীর্তন করে, প্রেমিকাকে তার আকাঙ্খা পূরণের প্রতি আহবান জানায়, নিজের অবস্থানকে ছোট করে প্রেমিকার মর্যাদাকে উর্ধে তুলে ধরে এবং তীব্র বিরহ বেদনায় ভোগে।

এর কারণ কি? অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে মানুষ কেন এধরনের আচরন করে না? কোন মানুষ টাকা অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রেমের কবিতা লেখে না। যদিও তারা টাকাকে পূজো করে অথবা আরো অনেক পার্থিব জিনিসের পিছনে দিনরাত ছুটতে থাকে? রুটির উদ্দেশ্যে কি কেউ প্রেমের কবিতা লেখে? অন্যের লেখা প্রেমের কবিতা শুনে বা পড়ে মানুষ কেন আনন্দ লাভ করে? হাফিজের প্রেমের কবিতা অসংখ্য মানুষকে কেন এত আনন্দ দেয়? এর কারণ কি এ নয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি এ সকল কবিতায় তাদের সমগ্র সত্তায় জড়িয়ে থাকা একটি গভীর ও সহজাত প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ করে?

তবে একথা পরিষ্কার যে প্রেমের কবিতাবলীর বহুসংখ্যক কবিতাই নারীকে উদ্দেশ্য করে পুরুষ লিখেছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ রুটি বা পানির মত নয় যে পেট ভরে খেলেই পুরুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে বরং তা কখনো ভোগের আকাঙ্খা হয়ে দেখা দেয় এবং নিত্য নতুন বহু নারীকে পেতে চায়, আবার কখনো তা প্রেমের আকার ধারণ করে এবং প্রেমের কবিতার জন্ম দেয়। কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যৌনলিপ্সা ও যৌন আকাঙ্খা শক্তিশালী হয় এবং কোন অবস্থায় প্রেম ও প্রেমের কবিতা আধ্যাত্মিক মানে উন্নীত হয় তা আমরা পরে এক সময় আলোচনা করব। যারা বলে যে, মানুষের দৈনন্দিন কাজের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ তারা কতই না ভুল করছে। দৈহিক ভালবাসার প্রকাশ ঘটানোর জন্য মানুষ বিশেষ ছন্দের আশ্রয় নিয়েছে। সেভাবে তারা রূহানী প্রেমের জন্যেও সেভাবে তারা ছন্দের আশ্রয় নিয়েছে। সাহিত্যে কিন্তু অত্যাবশ্যক জিনিসগুলো যেমন রুটি এবং পানি নিয়ে কবিতা লেখার জন্য বিশেষ ছন্দ চালু করার কথা কারো মনে উদিত হয়নি। সব ভালবাসার মূলেই দৈহিক কামনাই প্রধান অথবা হাফিজ বা সাদীর সব কবিতাই

তাদের যৌনচেতনা হতে সৃষ্ট সে কথা আমরা বলছি না। এ বিষয় অন্য সময় আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে।

যৌন কামনা হচ্ছে আগুনের মত এবং তা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। বিস্ময়কর ও শক্তিমান এ প্রবৃত্তির প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। একটি চাহনির 'বিপদ', মেয়ে-পুরুষের একাকী বসবাসের বিপদ এবং যে সহজাত প্রবৃত্তি নরনারীর মধ্যে মিলন ঘটায় এ সকল বিষয়ে বহু হাদীস রয়েছে।

ইসলাম এ সহজাত প্রবৃত্তিকে সংযত, বশীভূত এবং এর মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়কেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নারী ও পুরুষকে এক্ষেত্রে দেয়া দায়িত্বের মধ্যে একটি হচ্ছে পরস্পরের দিকে তাকানো সংক্রান্ত।

"বিশ্বাসী পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" (২৪ঃ৩০) "এবং বিশ্বাসী নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" (২৪ঃ৩১) সংক্ষেপে বলতে গেলে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন মেয়েরা এবং পুরুষেরা একে অন্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে, তারা যেন একে অন্যের সঙ্গে হাসি তামাশা না করে এবং একে অন্যের দিকে কামভাবে অথবা যৌন আনন্দ পাওয়ার জন্য না তাকায়।

মহিলাদের প্রতি ইসলামের বিশেষ একটি নির্দেশ রয়েছে। মহিলারা পরপুরুষ থেকে নিজেদের দেহ ঢেকে রাখবে, তারা নিজেকে এবং নিজেদের শরীরকে সমাজে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। নারীরা কখনো কোনভাবে পুরুষের মনযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবেনা।

মানুষের মন খুব সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। এ কথা মনে করা ভুল যে মানুষের যৌন আকাঙ্খা সীমিত এবং একটা পর্যায়ে পৌঁছে তা স্বাভাবিকভাবেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। মানুষ, পুরুষ হোক আর মহিলাই হোক, বিত্ত ও ক্ষমতা পেয়ে কখনো তৃপ্ত হয় না, আরো বিত্ত ও ক্ষমতার জন্যে তারা অব্যাহত প্রচেষ্টা চালায়। যৌন আকাঙ্খার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। কোন পুরুষের সৌন্দর্যের ক্ষুধা কখনো স্বাভাবিকভাবে পরিতৃপ্ত হয় না এবং কোন নারীই একজন মাত্র পুরুষের হৃদয় ও মনকে অধিকার করে কখনো স্বাভাবিক পন্থায় তৃপ্তি পায় না। একথা সুস্পষ্ট যে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্খা কখনো পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয় না।

অন্যদিকে সীমাহীন আকাঙ্খা অতৃপ্ত থাকার ফলে এক ধরনের অভাববোধ মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তা থেকে মানসিক অসুস্থতা ও জটিলতা দেখা দেয়। পাশ্চাত্যে মানসিক ব্যাধির এতো প্রকোপ কেন? কারণ হচ্ছে, যৌন ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা এবং খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, সিনেমা, থিয়েটার, সরকারী বেসরকারী পার্টি এমন কি রাজঘাট ও সরু গলিপথেও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির উপকরন ছড়িয়েথাকা।

ইসলামে মেয়েদেরই শুধু পর্দা করতে বলা হয়েছে। কারণ নিজেকে প্রদর্শন করার সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে মেয়েদের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। হৃদয় সংক্রান্ত ব্যাপারে মেয়েরা হচ্ছে শিকারী আর পুরুষেরা হচ্ছে শিকার। দৈহিক ব্যাপারে পুরুষেরা হচ্ছে শিকারী আর মেয়েরা হচ্ছে শিকার। নিজেকে প্রদর্শন করার প্রবৃত্তি আসে এই শিকারী মনোবৃত্তি থেকে। মেয়েরা চায়, পুরুষের মন জয় করে তাকে অনুগত রাখতে। আর এজন্যই মেয়েদের নিজেদেরকে ঢেকে রাখার নিয়ম ইসলাম চালু করেছে। কারণ বিচ্যুতি শুরু হয়েছে মেয়েদের প্রবৃত্তির কারণেই।

পরিবারের ভিত্তি মজবুত করা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যা কিছু পরিবারের শেকড়কে সুদৃঢ় করে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের বোধকে বৃদ্ধি করে তাই পারিবারিক কল্যাণের জন্য ভাল। এটা ঘটানোর জন্যে অবশ্যই সর্বতো উপায়ে চেষ্টা চালাতে হবে। এর উল্টোটাও সত্যি। যা' কিছু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে শীতল করে তাই একটা পরিবারের জন্যে ক্ষতিকর। এ গুলোর বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক পরিবেশে এবং আইনানুগ বিবাহ কাঠামোর মধ্যে যৌন চাহিদা মেটানোর সুযোগ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে। তাদের বন্ধনকে করে অধিকতর স্থিতিশীল।

হিজাব প্রথা ও আইনসংগত স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে যৌণ আকাঙক্ষা দমন করে রাখার বিধানকে পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তা এ রকম যে, এটা একজন আইনসংগত অংশীদারকে অন্য অংশীদারের মঙ্গল বয়ে আনতে সাহায্য করে। কিন্তু অবাধ যৌন স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একজন আর একজনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় যেখানে একজন আর একজনের সুখের ক্ষেত্রে কারারক্ষীর মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পরিবারে ঘৃণা ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

আজকাল তরুণরা সহজে বিয়ে করতে চায় না। তাদের বিয়ের কথা বললে বলে, "এত তাড়াহুড়ার কি আছে। আমার মোটেই বিয়ের বয়স হয়নি।" অন্যান্য অজুহাততো আছেই। অতীতে যুবকদের সবচেয়ে বড় বাসনাগুলোর মধ্যে একটা ছিল বিয়ে করা। তারা ইউরোপের সে আশীর্বাদ সম্পর্কে পূর্বে ততটা অবহিত ছিল না যা নারীদের পণ্যসামগ্রীরূপে উপস্থাপিত করেছে। অতীতে বিয়ে হতো অনেক বিবেচনা ও চিন্তা ভাবনার পর। এ কারণেই স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের মধ্যে সুখ-শান্তি খুঁজে পেত। আজকাল বিয়ের বাইরে যৌন বাসনার নিবৃত্তি সাধন এত সহজ যে আগের অনুভূতিগুলি বিদ্যমান থাকার কোন কারণ নেই। ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফলে বিয়েকে তাদের কাছে একটা দায়িত্ব আর সীমাবদ্ধতা মনে হয়। এর ফলে তাদেরকে নীতিকথা বলে বশ মানাতে হয়। এ কারণে একটি সাময়িকী পরামর্শ রেখেছে, যুবকদের জোর করে বিয়ে দেয়া দরকার। যে সমাজে বিয়ের মধ্যেই যৌন সম্পর্ক সীমিত থাকে তার সঙ্গে যে সমাজে অবাধ যৌণ সম্পর্ক চালু আছে তার মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম

সমাজে বিয়েটা হলো প্রত্যাশা ও বঞ্চনার অবসান আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বঞ্চনা এবং সীমাবদ্ধতার শুরু।

অবাধ যৌন স্বাধীনতা যেখানে রয়েছে সেখানে বিবাহবন্ধন ছেলেমেয়ের স্বাধীন জীবন শেষ করে দেয় এবং তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার পাঠ নিতে বাধ্য করে। অথচ ইসলামী সমাজে বিবাহ বন্ধন তাদের বঞ্চনার অবসান ঘটায় এবং তাদের আশা-আকাঙ্খার পূর্ণতা দান করে।

অবাধ যৌন স্বাধীনতা প্রথমতঃ বিবাহ ও পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে ছেলেদের একটা অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে দেয়। যৌবনের শক্তি ও প্রেরণা নিস্তেজ হয়ে আসার পূর্বে তারা বিয়ে করতে চায় না। তারপর তারা একটি মেয়ে নিয়ে আসে, যার কাজ হল সন্তান ধারণ, ঘর পরিষ্কার রাখা এবং চাকরাণী হিসেবে কাজ করা। দ্বিতীয়তঃ তা বিবাহের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। বিবাহের ভিত্তি হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রেম ও গভীর ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রী সেখানে একে অপরের সুখের সাথী। কিন্তু যৌনস্বাধীন সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা তাদের বিবাহ সঙ্গীকে এমন এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখে যে তাদের স্বাধীনতায় অবরোধ আরোপ করে এবং জীবনকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। তাদের ভাষায়, তারা পরস্পরের জন্যে কয়েদখানার প্রহরী হয়ে দেখা দেয়। একটি ছেলে বা মেয়ে 'আমি বিবাহিত' বলতে গিয়ে বলে, 'আমি একজন কারারক্ষীর অধীনে আছি।' এর অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, বিয়ের পূর্বে তারা যত্রতত্র এবং যার তার সাথে মেলামেশা করেছে। তাদের কাজ সম্পর্কে কেউ কিছু বলার ছিল না।

বিয়ের পর এ স্বাধীনতা আর থাকে না। যদি স্বামী বিয়ের পর অধিক রাতে বাড়ি ফেরে তাহলে তাকে কৈফিয়ত দিতে হয়, কোন কমবয়সী মেয়ের সাথে কথা বললে স্ত্রী বাধা দেয়। এ ধরনের পদ্ধতিতে পারিবারিক বন্ধন কতটুকু দুর্বল এবং শীতল হতে পারে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

রাট্রান্ড রাসেলের মতো কিছু মানুষের বিশ্বাস হলো, মুক্ত জীবন যাত্রায় বাধা প্রদান শুধু মানুষের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হবার জন্যই নয়, কারণ এই বাধা দূর করার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু হয়েছে।

তাই প্রশ্ন শুধু এই-ই নয় যে, প্রকৃতপক্ষে জনক কে। আসল ব্যাপার হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র অনুভূতি থাকতে হবে এবং তাদের সম্পর্কটা হওয়া উচিত ঐক্য ও সংহতির ভিত্তিতে। এইসব লক্ষ্যে তখনই পৌঁছানো যাবে, যখন স্বামী-স্ত্রী অন্য স্বামী-স্ত্রীদের নিয়ে মাথা না ঘামাবে, যখন স্বামী অন্য কোন স্ত্রীলোকের দিকে নজর না দেবে

এবং বিয়ের আগে ও পরে পরিবারের বাইরে যৌনকামনা চরিতার্থ করাকে নিষিদ্ধ নীতি হিসেবেমেনেনেবে।

যারা রাসেল অথবা তার মতো লোকদের কথায় প্রভাবান্বিত এবং নতুন 'যৌন নীতিশাস্ত্রে' বিশ্বাসী তারা স্বামী থাকতেও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটা সত্যি এ' ধরনের একজন স্ত্রীলোক চাইবে তার সন্তান তার স্বামীর না হয়ে তার প্রেমিকের হোক যাকে সে এখন ভালবাসে। এটাই স্বাভাবিক যে একজন স্বামী চাইবে তার সন্তান ধারণ করুক এমন একজন স্ত্রী যে তাকে ভালবাসে, এমন একজন নয় যাকে আইন তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এজন্যেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতিসমূহ থাকা সত্ত্বেও ইউরোপে জারজ সন্তানের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক স্থিতিশীলতা

যৌনকামনাকে পারিবারিক সীমানার বাইরে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ফলে সমাজের কাজ করার ক্ষমতা এবং কার্যকলাপ দুর্বল হয়ে পড়েছে। যদিও বলা হয় যে, হিজাব সমাজের অর্ধেক সদস্যের কার্যক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। কিন্তু হিজাবের অভাব এবং মুক্ত জীবন যাত্রার বিকাশ সমাজের কার্যকরী শক্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। হিজাবের অনুপস্থিতি মেয়েদের শক্তিকে পঙ্গু এবং তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগকে ব্যাহত করেছে।

ইসলামী হিজাব কখনো মেয়েদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। ইসলাম মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেনি, তেমনি ইসলাম মেয়েদের জ্ঞানচর্চাকে নিষিদ্ধ করেনি। বরং ইসলাম বলেছে পুরুষ এবং মেয়েরা উভয়েই লেখাপড়া শিখবে এবং জ্ঞানচর্চা করবে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপে মেয়েদের অংশগ্রহণে ইসলামে কোন বাঁধা নেই। ইসলাম নারী সমাজকে কখনো অকর্মণ্য ও বেকার থাকতে বলেনি। মেয়েরা অযোগ্য ও বেখেয়াল সন্তান-সন্ততি লালন পালন করবে-ইসলাম তা চায় না। মুখ এবং হাত বাদে শরীরের বাকী অংশ ঢেকে রাখার বিধান কোন ধরনের সাংস্কৃতিক অথবা সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্যে নয়। মানুষের কর্মশক্তিকে সেই পরিবেশই পঙ্গু করে দেয় যেখানে যৌন আকাঙ্খা চরিতার্থ করার পরিবেশ বিদ্যমান থাকে।

যদি ছেলে এবং মেয়েরা আলাদা পরিবেশে পড়াশুনা করে অথবা একই জায়গায় বিদ্যালাভ করে যেখানে মেয়েরা তাদের শরীর ঢেকে রাখে এবং কোন সাজসজ্জা করে না তাহলে কি তারা আরো ভালভাবে পড়াশোনা করে না? এমনি পরিবেশে তারা আরো ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করতে পারে এবং শিক্ষকদের কথায় মনোযোগ দিতে পারে। এর তুলনায় এটা কি ভাল যে ছেলেরা এমনি পরিবেশে লেখাপড়া কর ন যেখানে তাদের পাশাপাশি মেয়েরা সেজেগুজে বসে এবং তাদের পরিধানে এমন স্ক থাকে যা হাঁটু সমান লম্বাও নয়? পুরুষরা কি এমন পরিবেশে ভাল কাজ করে যেখ ন রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, কল-কারখানা এমন সব মহিলায় পরিপূর্ণ যারা সেজেগুজে আছে এবং যাদের শরীর কাপড়ে ঢাকা নয়, নাকি সেই পরিবেশে যেখানে এ ধরনের অবস্থা অনুপস্থিত? যে সকল কোম্পানী বা অফিস তাদের কাজের ব্যাপারে আন্তরিক

এবং ভালভাবে কাজ করতে চায় তারা এ রকম অবাধ মেলামেশা ঘটতে দেয় না। কথাটা বিশ্বাস না হলে নিজেই খোঁজ নিয়ে দেখুন।

বাস্তব কথা হলো, বিপ্লবের আগে ইরানে লজ্জাকরভাবে হিজাবের অনুপস্থিতির ফলে ইরান কোন কোন দিক দিয়ে আমেরিকার চেয়েও এগিয়ে ছিলো। এটা ছিল নীতিহীন পুঁজিবাদী পশ্চিমা প্রভাবের কুফল। এটা হচ্ছে অর্থপূজা এবং যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে ব্যতিব্যস্ত পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজের অবদান। এর মাধ্যমে তারা মানব সমাজকে নিজ সুবিধায় আনে এবং তাদেরকে এ শক্তি দিয়ে উত্তেজিত করে তাদের পণ্যের ক্রেতায় পরিণত করে। যদি কোন ইরানী স্ত্রীলোক স্বামীর জন্যে সাজসজ্জা করে অথবা শুধুমাত্র মেয়েদের অনুষ্ঠানের জন্যে ভালো পোষাক পরিধান করে তাহলে সে পশ্চিমা পণ্যের ব্যবহারকারী হবে না। শোষকদের স্বার্থের রক্ষক হিসেবে সে আমাদের তরুণ-তরুণীকে চারিত্রিক দিক দিয়ে বিপথগামী করতে চেষ্টা করবে না এবং সমাজের কর্মক্ষম সদস্য হিসেবে তরুণদের গড়ে উঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শোষকদের হাতের অস্ত্র হিসেবে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিবে না।

১· কোরআন, ৩৮ঃ৩২

২· মালিক আশতারের চিঠি, নাহজুল বালাগা

৩· ইবনে খালেদুন, মুকাদ্দিমা

৪· কোরআন ৩৩ঃ৩২; সহিহ মুসলিম ৪র্থ খন্ড, ১৪৮-১৫১ পৃষ্ঠা

৫· কোরআন ৩৩ঃ৩৩

৬· কোরআন ৩৩ঃ৫৩

৭· কোরআন ২৪ঃ৩০

৮· কোরআন ২৪ঃ৩১

৯· কোরআন ৩৩ঃ৫৯

১০ আর্থার ক্রিসেনসেন, "L Iran sons les Sassanides."

প্রথম অধ্যায়

হিজাব বিকাশ লাভের কারণ

প্রথম অংশ

আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে হিজাবকে ঘিরে। তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমার মনে হয় এ বিষয় নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করাই উত্তম।

হিজাব সম্পর্কিত আলোচনা হবে সাধারণভাবে দার্শনিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা হিজাবের অস্তিত্ব ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল এবং অন্য জায়গার চেয়ে সাসানী ইরানেই এটা বেশী চালু ছিল। এর কি কারণ রয়েছে এবং এ থেকে কি বুঝা যায়? এ কারণগুলোর কিছু কিছু দিক কোন কোন সমাজের জন্যে কি সত্যি ছিল? অন্যকথায় হিজাবের আবির্ভাবের কারণগুলো কি কিছু বিশেষ স্থানসমূহের বেলায় সত্যি? তারপর আমরা দেখবো, যে কারণগুলো তারা দিয়েছে সেগুলো ইসলামী হিজাবের বেলায়ও প্রযোজ্য কিনা? আমরা ইসলাম থেকেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বের করবো।

দ্বিতীয় আলোচনা হবে হিজাবের ব্যাপারে একজন মানুষ কি কি সমস্যা দেখতে পায়, এর কি সমালোচনা রয়েছে এবং যে অসুবিধাগুলোর কথা উল্লেখ করা হয় সেগুলো সম্পর্কে। এর খারাপ দিকগুলো যা অন্যেরা উল্লেখ করে আসলেই সেগুলো কি? সুতরাং দ্বিতীয় আলোচনা হবে সমালোচনাকে ঘিরে।

তৃতীয় আলোচনা হবে ইসলামী হিজাবকে ঘিরে, এর ইতিহাস নিয়ে, অন্ধকার যুগে আরবে হিজাব ছিল কিনা এবং ইসলাম কি এটাকে অনুমোদন করে এর সীমানা বাড়িয়েছে না কমিয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে। নাকি অন্ধকার যুগে হিজাব ছিল না এবং ইসলামই একে প্রতিষ্ঠিত করেছে?

এর পরের প্রশ্ন হল, ইসলামী হিজাব বলতে কি বুঝায়? পবিত্র কুরআনের আয়াত ও তাফসির, মহানবী (দঃ) এর হাদীস, মাসুম ইমামদের কথা এবং যে দুটো সূরায়–সূরা নূর ও সূরা আহজাব–এ সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে সেগুলোর আলোকে এখানে আলোচনা করা হবে।

দার্শনিক কারণ

সামাজিক বিশ্লেষকগণ প্রায়ই হিজাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, এমনকি প্রকৃতিতেও পুরুষ এবং স্ত্রীদের মধ্যে কোন আবরণ টানা হয়নি। তারা আরও বলেন, প্রকৃতিতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে পুরুষ এবং নারী প্রজাতির মধ্যে কোন আবরণ বা পর্দা আছে, যেখানে নারী প্রজাতি পর্দার আড়ালে থাকে এবং কোন আবরণ পরিধান করে। হিজাব প্রথা প্রচলনের পেছনে পাঁচটি কারণ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। দার্শনিক কারণটি সুখ সম্ভোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বীয় নফসকে পরাভূত করা এবং কঠোর সংযম সাধনার সাথে সম্পর্কিত। প্রাচীন ভারতের পরিস্থিতিই এ ধরনের চিন্তার উৎস বলে মনে হয়। নারী সমাজ যেহেতু যৌন লালসা পূরণের সর্বোচ্চ মাধ্যম সেহেতু সংযমী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এক সময় নারী ও পুরুষের মধ্যে এক ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়। তাদের ধারণা ছিল, পুরুষকে যদি নারীদের সাথে অবাধে মেলামেশা করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে একজন পুরুষ শুধু যৌন সম্ভোগেই ব্যস্ত থাকবে এবং অন্যান্য দিক দিয়ে সমাজ পিছিয়ে পড়বে। সুতরাং যৌন আনন্দ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রেখে রিপুকে বশীভূত করার পথে পুরুষকে সংগ্রাম করে যেতে হবে।

রমণীদের মত অন্য যেসব জিনিস মানুষের মনে কামভাব সৃষ্টি করে সেগুলির বিরুদ্ধেও তারা সংগ্রাম করে। যেমন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং অপরিচ্ছন্নতাকে প্রশ্রয় দান। এটা ভাবা ঠিক নয় যে, কিছু লোকের এরকম করার পেছনে রয়েছে উদাসীনতা বা হঠকারিতা। এর মূলে রয়েছে এক দর্শন। বার্ট্রান্ড রাসেল যেমন তার বই "বিবাহ এবং নীতিশাস্ত্রে" উল্লেখ করেছেন, খৃষ্টান ধর্মের সূচনালগ্নে এ ধরনের চিন্তাধারা সেন্ট পল-এর মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করে যখন কৌমার্য স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিরাট সংখ্যায় মানুষ শয়তানকে ধ্বংস করার জন্যে অরণ্যের দিকে যাত্রা করে। সে সময় রোমান চার্চও গোসল প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে বলে, দেহ পাপের দিকে ধাবিত করে। চার্চ অপরিচ্ছন্নতাকে স্বাগত জানায় এবং দৈহিক দুর্গন্ধ পবিত্র সুবাসের মর্যাদা লাভ করে।

আমার মনে হয় যেসব দরবেশ তপস্যা করেন এবং রমণীদের থেকে দূরে থাকেন তারা একই কারণে চুলও বড় রাখেন। তারা বলেন যে, চুল ছোট করলে বা কেটে ফেললে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তার মানে হচ্ছে বড় চুল যৌনকামনাকে অবদমিত করে।

এ ধারণাটা অতীতে প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবতঃ এটা সত্যি যে, সমস্ত শরীরের সব চুল এবং লোম কেটে ফেললে তা যৌন আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে। সুতরাং ভারতীয়রা এবং শিখরা যারা তাদের চুল এবং লোম কাটাকে নিষিদ্ধ করেছে তারাও ওই একই কারণে তা করেছে; কেননা তারাও সংযম সাধনায় লিপ্ত ছিল। কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীতে হিজাব এসেছে সন্দেহাতীতভাবে সংযম থেকে। তারপর তারা প্রশ্ন তুলেছেন কেন সংযমপ্রথা চালু হল এবং কেন তা বিস্তার লাভ করলো? তারা এর জন্যে দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ নিম্নবিত্ত লোকদের মধ্যে কিছু লোক মেয়েদের সাথে নিয়ে চলাফেরা করত। মেয়েদের প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল। তারপর দেখা গেল তাদের প্রিয় নারীকে তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। ফলে হঠাৎ করে তাদের মধ্যে মেয়েদের বিরুদ্ধে এক ধরনের ঘৃণার মনোভাব তৈরী হয়। বিশেষভাবে তাদের প্রিয় নারী যখন তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তখন ঘৃণা আরো প্রবল হয়। এ ঘৃণা শেষ পর্যন্ত গোটা নারী জাতির বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন অনিবার্যভাবেই তারা কৌমার্য ও সংযম সাধনার পথ অবলম্বন করে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে নারী জাতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। শেষ পর্যন্ত এ মনোভাবকে তারা সাধুদের দর্শন হিসেবে উপস্থাপিত করে।

কঠোর আত্মসংযমের পথ অবলম্বনের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে প্রথমটির বিপরীত। যারা সারাজীবন প্রচুর নারীসম্ভোগে লিপ্ত ছিল এবং মাদকদ্রব্য অথবা উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ করার ফলে সব সময়ই তারা কোন না কোনভাবে উত্তেজিত থাকত তারা হঠাৎ যৌনতা থেকে দূরে সরে যায়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে এটা আছে, কোন কিছু করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করলে পরে সেটার প্রতি আর আকর্ষণ থাকে না; সেটা যতই আনন্দদায়ক হোক না কেন! জীবনের শেষলগ্নে এসে যৌণসম্ভোগের প্রতি তাদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এ রকম উদাহরণ আছে যে, জীবন সায়াহ্নে এসে সুলতানরা যৌনক্রিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, যার ফলে নারীদের প্রতিও তাদের এক রকম বিরাগ লক্ষ্য করা যায়।

সে যাই হোক। তাদের বক্তব্য হল, হিজাব এবং নারী–পুরুষের মধ্যে দেয়াল সৃষ্টির পেছনে বৈরাগ্যবাদী দর্শন কাজ করেছে। বস্তুবাদীদের মধ্যে যারা সংযমী জীবন এবং সংযম সাধনার পক্ষে তারা উপরের দুটো কারণকেই বিবেচনা করেন।

এই দুটো কারণ সম্পর্কে আমরা বলছি না যে এদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল না। এগুলো থাকতে পারে এবং ফলস্বরূপ এসব ফলাফল ঘটতেও পারে। কিন্তু আমরা

পরে বলবো ইসলাম হিজাবকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এটা আরবের অন্ধকার যুগে ছিল না। আমাদের দেখতে হবে যে, ইসলামে এসব কারণ উল্লেখিত হয়েছে কিনা এবং কারণ হিসেবে তাদের দাঁড় করা হয়েছে কিনা অথবা অন্য কোন কারণ নির্দেশ করা হয়েছে কিনা। সংযমের ইসলামী চেতনা কি? সংযমের যে ধারণার কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে ইসলামী সংযমসাধনা মিলে যায় কিনা? আমরা দেখবো যে, ইসলাম কখনো এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেনি, বরং ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এমনকি অমুসলিমরাও জানে যে, ইসলাম কখনো বৈরাগ্যবাদকে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে প্রশ্রয় দেয়নি। যে মতবাদ হিন্দু ধর্ম থেকে শুরু হয়ে খৃষ্টান ধর্মে ছড়িয়ে পড়েছিল ইসলামে তার কোন স্থান ছিল না। এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম বলে-"ঈমান থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আসে।" মহানবী (দঃ) একবার এমন একজনকে দেখলেন যার চুল এলোমেলো, কাপড় নোংরা এবং দেখতে বিশ্রী লাগছিল। তিনি বললেন, "আনন্দ এবং সৃষ্টিকর্তার নেয়ামতসমূহ ভোগ করা ধর্মের অংশ।"[২]

মহানবী (দঃ) বলেছেন, "সৃষ্টিকর্তার নিকৃষ্ট বান্দাহ হচ্ছে তারা, যারা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।"[৩] আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী (আঃ) বলেছেন,"সৃষ্টিকর্তা নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"[৪]

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন, "সৃষ্টিকর্তা সুন্দর এবং তিনি চান তার সৃষ্ট জীবরা পরিশীলিত থেকে তাদের সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটাক। এর উল্টোটাও সত্যি। তিনি দারিদ্র্য এবং দারিদ্রের ভানকে শত্রু হিসাবে গণ্য করেন। সৃষ্টিকর্তা যে নেয়ামত তোমাকে দিয়েছেন তোমার জীবনে অবশ্যই এর প্রকাশ ঘটতে হবে। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, "কিভাবে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদকে প্রদর্শন করতে হবে?" তিনি বললেন, "কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রেখে, বাড়ীতে চুনকাম করে, বাড়ীর প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রেখে এবং সূর্যাস্তের আগে ঘরের আলো জ্বালিয়ে। এ ভাবে এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাবে।"[৫]

সবচেয়ে প্রাচীন কিতাব 'কাফী' বর্তমানে আমাদের হাতের কাছে আছে। এ কিতাবখানা এক হাজার বছরের পুরানো। এতে 'বাব আল্ জিয়া ওয়াত্ তাজাম্মুল' নামক একটি অধ্যায় রয়েছে। এতে বলা হয়েছে। ইসলাম চুলছাঁটা, চুল আঁচড়ানো, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং চুলে তেল দেয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আরও ভালভাবে উপাসনা করা এবং উপাসনা থেকে আরও রূহানী আনন্দ পাওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর কিছু সাহাবী তাদের স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের

পরিত্যাগ করেন। তারা দিনের বেলা রোজা রাখতেন আর রাত জেগে উপাসনা করতেন। নবীজীর (দঃ) কানে একথা পৌঁছালে তিনি তাদেরকে এরকম জীবন–যাপন করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি বলেন, ''যে আমি তোমাদের নেতা সেই আমিও এ রকম করি না। আমি কোন কোন দিন রোজা রাখি, কোন কোন দিন রাখি না। রাতের একাংশে আমি এবাদত করি অন্য অংশে আমার স্ত্রীদের সঙ্গে অতিবাহিত করি।'' এই সাহাবীরা তখন খোজা হয়ে যাবার জন্যে মহানবী (দঃ) অনুমতি চাইলেন। তিনি তা অনুমোদন করেননি এই বলে যে ইসলামে এটা নিষিদ্ধ।

একবার তিনজন স্ত্রীলোক রাসূলুলাহ (দঃ) কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাজির হন। তাদের একজনের অভিযোগ ছিল, তার স্বামী মাংস খান না, আরেকজনের অভিযোগ ছিল তার স্বামী সুগন্ধিদ্রব্য পছন্দ করে না; সর্বশেষ জনের অভিযোগ ছিল তার স্বামী তার থেকে দূরে থাকে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (দঃ) হঠাৎ রেগে গেলেন। তিনি জোব্বা খুলে রেখে ঘর থেকে মসজিদে আসলেন। মিনারের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বলতে লাগলেন, ''আমার সেই বন্ধুদের ব্যাপারে কি করা যায়, যারা মাংস, সুগন্ধিদ্রব্য এবং স্ত্রীলোক পছন্দ করে না। আমি নিজে মাংস খাই, সুগন্ধিদ্রব্য পছন্দ করি এবং আমি আমার স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ পাই। যারা আমার প্রদর্শিত পথে চলে না তারা আমার দলভুক্ত নয়।''[৬]

পোষাকের দৈর্ঘ্য কমানোর জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কারণ আরবরা এত লম্বা পোষাক পরত যা' মাটিতে গড়াগড়ি খেতো। রাসূলুল্লাহ (দঃ)–এর নিকট নাযিল হওয়া প্রথম আয়াতগুলির একটি হচ্ছে, ''তোমার ভূষণ পবিত্র কর''[৭] (৭৪ঃ৪)। এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথাই বলা হয়েছে।

সাদা কাপড় পরাকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে, প্রথমতঃ সৌন্দর্য্য এবং দ্বিতীয়তঃ পরিচ্ছন্নতার জন্যে। সাদা কাপড়ে ময়লা সহজে দেখা যায়। হাদীস শরীফে এ কথা বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক (দঃ) তার সাহাবীদের সাথে দেখা করার আগে আয়নায় নিজেকে দেখে নিতেন, চুল আঁচড়াতেন এবং পোষাক–পরিচ্ছদ ঠিক আছে কিনা সেটাও দেখতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সেসব বান্দাদের পছন্দ করেন, যারা পরিশীলিত হয়ে তাদের বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যায়।'' অর্থাৎ সাদা পোষাক পরিধান কর। কারণ সাদা পোষাক অধিকতর সুন্দর ও পবিত্র।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আছে, সাজগোজের উপকরণ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের জন্যে সৃষ্টিকর্তার দয়ার একটি নিদর্শন। আবার কোরআন শরীফে যারা পৃথিবীর

সৌন্দর্যসমূহ উপভোগ করা থেকে বিরত তাকে তাদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, ''আল্লাহ তার বান্দাহদের জন্যে যে সব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে?''(৭ঃ৩২)[১০]

কোরআনের এ আয়াত ব্যবহার করে মাসুম ইমামগণ সূফীদের সাথে সবসময় তর্ক করেছেন এবং এভাবে সূফীদের কার্যকলাপকে নাকচ করে দিয়েছেন।[১১]

স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলনে যে বৈধ আনন্দ পায় ইসলামের দৃষ্টিতে তা আশীর্বাদস্বরূপ এবং স্বর্গীয় দান হিসেবে গণ্য করা হয়। বিদেশীদের কাছে এই জিনিসটি অযৌক্তিক বলে মনে হয়। হয়তো তারা নিজেকে বলে, "কি আশ্চর্য? একটা নোংরা কাজকে কিভাবে আশীর্বাদ বা আধ্যাত্মিক পুরস্কার হিসেবে তারা গণ্য করে।" যৌন মিলনের পর ফরজ গোসলের মাধ্যমে শরীরের ঘাম পরিষ্কার করার মধ্যে কি পরিমাণ সওয়াব রয়েছে তা অনুধাবন করা একজন খ্রীষ্টান বা হিন্দুর জন্যে বিস্ময়ের বিষয়।

ইসলাম বিভিন্ন বিষয়ে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সীমানার মধ্যে থেকে অনেক কিছু করার ক্ষেত্রে ইসলামে শুধু যে নিষেধাজ্ঞা নেই তা নয়, বরং সেখানে উৎসাহও দিয়েছে। নারী জাতির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনকে ইসলাম এমন একটি কাজ হিসেবে অভিহিত করে যা আল্লাহর নবীরা স্বয়ং করে গিয়েছেন।

'ওয়াসাইলে' একটি হাদীস রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'নারী জাতির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন নবীদের ফেতরাতের অন্তর্গত।' মহানবী (দঃ) বৈরাগ্যবাদ, সন্যাস ধর্ম ও মঠবাসীদের মত জীবন যাপনকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ ভাবে ইসলাম মহিলাদের সাহস ও আশার বাণী শুনিয়েছে।[১২]

একই সঙ্গে মেয়েদের বলা হয়েছে তারা যেন স্বামী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে পারতপক্ষে মেলামেশা না করে। স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যে সাজগোজ করে নিজেদেরকে স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা স্ত্রীদের অবশ্য কর্তব্য। যারা তা' করে না তাদের প্রতি অভিশাপও দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে স্বামীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলা হয়েছে।

হাসান ইবনে জাহম বলেন, "আমি হযরত মূসা ইবনে জাফরকে দেখতে গেলাম এবং দেখলাম তিনি তাঁর চুলে রং ব্যবহার করেছেন। আমি বললাম, "আপনি কি মেহদী ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ। একজন পুরুষের মেহদী ব্যবহার করা এবং ভালো ও পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরা তার স্ত্রীর সতীত্বের নিশ্চয়তা। তাদের

স্বামীরা আকর্ষণীয়ভাবে পোশাক পরিচ্ছদ পরে না বলে কিছু কিছু নারী বিপথগামী হয়।"[১৩]

রাসূলুল্লাহ (দঃ)–এর অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে সব ইহুদী স্ত্রীলোক ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের স্বামীরা এতো নোংরা অবস্থায় থাকে যে, স্ত্রীরা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকে এমন আকর্ষণীয় পুরুষ খুঁজে বেড়ায়।"[১৪]

ওসমান ইবনে মা'জুন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বাণীসমূহ যারা রেকর্ড করে রাখতেন সেসব সাহাবীদের একজন ছিলেন। তিনি সন্যাসীদের অনুকরণে এই পৃথিবী থেকে দূরে সরে থাকবার চেষ্টা করতেন এবং যৌনমিলন থেকে বিরত থাকতেন। তার স্ত্রী নবীজীর (দঃ) দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ), আমার স্বামী সারাদিন রোজা রাখে এবং রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে নামায পড়ার জন্যে।" একথা শুনে মহানবী রেগে গেলেন এবং ওসমানের বাড়ীতে গেলেন। ওসমান তখন নামাজ রত ছিলেন। তার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হুজুরে পাক (দঃ) অপেক্ষা করলেন। তারপর তিনি বললেন, "হে ওসমান, বৈরাগ্য এবং সন্যাসধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমাকে আল্লাহ পাক এ পৃথিবীতে পাঠাননি। সৃষ্টিকর্তা আমাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহর দেয়া সহজ ও শাশ্বত বিধান চালু করতে এবং মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা বলার জন্যে। আমি নামাজ পড়ি, রোজা রাখি এবং স্ত্রীদের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক অটুট রয়েছে। ইসলামের নির্দেশ এবং আমার সহজাত প্রকৃতির মধ্যে মিল রয়েছে। দ্বীনের প্রতি যার ভালবাসা আছে তার কর্তব্য হল আমাকে অনুসরণ করা। বিয়ে হচ্ছে আমার রীতিসমূহের একটি।"[১৫]

বৈরাগ্য বা সন্যাস ধর্ম পৃথিবীর কোথাও কোথাও থাকলেও ইসলামে এসবের কোনো স্থান নেই।

সামাজিক কারণ

নিরাপত্তাহীনতাকে হিজাব আবির্ভাবের আর একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তারা বলেন, যেহেতু নারীদের কোন নিরাপত্তা ছিল না তাই অবগুণ্ঠন প্রথা চালু হয়। ইতিহাসে একসময়ে যারা শক্তিশালী এবং ক্ষমতাধর ছিল তারা ইচ্ছে করলে সবকিছুই পেতে পারতো। কারো সম্পদ টাকাপয়সা বা মূল্যবান অলংকার থাকলে সে তা লুকিয়ে রাখতো যাতে করে কেউ জানতে না পারে যে সে অনেক ধনসম্পত্তির মালিক। কারণ তা হলে কেউ যদি ক্ষমতার বলে ধনসম্পত্তির উপর ভাগ বসাতে চাইতো বা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইতো তাহলে দুর্বল বলে তার এর কোনো প্রতিবাদ করার শক্তি থাকতো না। এমনকি ধনী লোকেরা তাদের সন্তানদেরও জানতে দিতো না যে, কোথায় তাদের কতো ধনসম্পদ লুক্কায়িত আছে। সন্তানদের ধনসম্পদের কথা জানতে দিলে হয়তো তারা তাদের বন্ধুদের বলে বেড়াবে এবং ফলে ক্রমে ক্রমে সকলেই জেনে যাবে তাদের সম্পত্তির কথা, এই ভয়ে ধনী লোকেরা এরকম করতো। ফলে তাদের মৃত্যুর পরও তাদের সঞ্চিত অর্থ বা সম্পদের কথা কেউ না জানায় সেগুলো লুক্কায়িত অবস্থায়ই থেকে যেতো। সে যুগে নিরাপত্তাহীনতা খুব ব্যাপক ছিল।

অর্থ বা সম্পত্তির মতো মেয়েদের ব্যাপারেও এরকম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করতো। টাকা-পয়সা অথবা সম্পদের মতো অতীতকালের মানুষ তাদের মেয়ে অথবা স্ত্রীদেরও নিরাপত্তাহীনতার কারনে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতো। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সাসানীয় ইরানে উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক অথবা রাজপুত্ররা সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্কে শুনতে পেলেই তাদের খুঁজে বের করে দখল করতো। তখন হিজাবের উদ্দেশ্য ছিলো মেয়েদের লুকিয়ে রাখা যাতে তারা কারো নজরে না পড়ে। উইল ডুরান্ট তার 'পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে প্রাচীন ইরানের অবস্থার উপর আলোকপাত করেছেন। কাউন্ট গোবিনোও হিজাব সম্পর্কে লিখেছেন, "ইরানে বর্তমানে যে হিজাব প্রথা চালু আছে তা ইসলামের সাথে নয়, ইসলাম-পূর্ব ইরানের সাথে মৌলিকভাবে সম্পর্কযুক্ত।" তিনি বিশ্বাস করেন, ইরানীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে ইরানী হিজাব প্রথা অন্যান্য স্থানের থেকে আলাদা।[১৬]

প্রাচীন ইরানে মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষদের পক্ষ থেকে কোনো রকম নিশ্চয়তা ছিলো না। আনুশেরওয়ানের সময়ে সেনাবাহিনীর একজন মেজরের সুন্দরী স্ত্রী ছিলো।

যদিও সেই মেজর তার স্ত্রীকে লুকিয়ে রেখেছিলো তবুও সেই রমণীর রূপের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। একদিন যখন মেজর শহরের বাইরে ছিলো তখন আনুশেরওয়ান তার বাড়ীতে তার স্ত্রীর কাছে যান। স্বামী ফিরে এলে স্ত্রী তাকে এই ঘটনা জানায়। লোকটি চিন্তা করে দেখলো, এখন সে যে শুধু তার স্ত্রীকে হারাবে তাই নয়, তাকে নিজের কাছে রাখতে গেলে তার নিজের জীবনাশংকাও রয়েছে। এই ভেবে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলো। আনুশেরওয়ান এ খবর জানতে পেরে সেই মেজরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি জানি তোমার একটা সুন্দর বাগান ছিলো যা তুমি বিক্রি করে দিয়েছো। কিন্তু কেন?" জবাবে মেজর বললো, "হে মহাত্মন, আমি সেই বাগানে সিংহের পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে ভীত হলাম এই ভেবে যে, সিংহটা আমাকে খেয়ে ফেলবে।' তিনি হাসলেন এবং বললেন, "এখন আর সেই সিংহকে সেই বাগানে দেখা যাবেনা।"

তাই সুন্দরী রমণীদের কোন নিরাপত্তা ছিলো না। প্রত্যেকেই ভয়ে ভয়ে বসবাস করতো এবং এটাই হিজাবের আবির্ভাবের কারণ ছিলো। তারা এরপর বলে, এখন যেহেতু সেই ভয় আর নেই যে কেউ জোর করে অন্য কারো স্ত্রীকে দখল করবে সেহেতু এখন 'হিজাব' পদ্ধতিটির আর কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে যেহেতু ধনসম্পদের মতো স্ত্রীলোকের ব্যাপারেও নিরাপত্তা বিরাজ করছে সুতরাং 'হিজাব'–এর এখন কোন প্রয়োজন নেই।

এটাকে আমাদের ইসলামী দর্শনের সঙ্গে তুলনা করতে হবে। এটাই কি কারণ ছিলো যে ইসলাম এজন্যে 'হিজাব' পদ্ধতি চালু করেছে? নিরাপত্তাহীনতার জন্যেই তা করেছে? বিষয়টির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় ইসলামী ব্যাখ্যাতত্ত্বে এধরনের বিষয় কখনো আসেনি। ব্যাপারটা শুধু তা নয় এমনকি ইতিহাসের সঙ্গেও এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্ধকার যুগে আরব বেদুইনদের মধ্যে 'হিজাব' ছিলো না কিন্তু নিরাপত্তা ছিলো। বেদুঈনদের উপজাতীয় চরিত্রই নারীদের রক্ষা করতো।

বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে নিরাপত্তার অভাব ছিলো তাহলো সামাজিক অথবা দলগত। আবরণ এ ধরনের সমস্যার কোনো সমাধান নয়। গোত্রে গোত্রে সংঘর্ষ বাধলে তারা যে শুধু পুরুষদেরই বন্দী করতো তা নয়, নারী, তাদের সন্তান এবং অন্য সবকিছুই লুট হয়ে যেতো। আমাদের শিল্পোন্নত যুগের সঙ্গে বেদুইনদের যতই অমিল থাকুক না কেন একটা ব্যাপারে আমাদের জীবনের সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার একটা মিল ছিল আর তা হলো ব্যভিচার, বিশেষ করে বিবাহিতা নারীদের ক্ষেত্রে। কিন্তু বিশেষ এক ধরনের গণতন্ত্র থাকায় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যাচার না থাকায় কেউই

জোর করে অন্য কারো স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেয়ার মতো ঘটনা ঘটতো না। তবু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব যা শিল্পোন্নত পাশ্চাত্যে প্রকট, বেদুইনদের মধ্যে ছিলো না। 'আবরণ' এক জায়গায় বসবাসরত মানুষের বেলায় আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু এ ধরনের আক্রমণের অস্তিত্ব বেদুইনদের মধ্যে নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি না যে, ইসলামী বিধান হিজাবের আবির্ভাব ঘটিয়েছে শুধু নিরাপত্তার স্বার্থে। আবরণের ইসলামী দর্শন এ থেকে ভিন্ন এবং এ ব্যাপারে আমরা পরে ব্যাপক আলোচনা করবো। আমরা এটা বলি না যে পুরুষের আক্রমণ থেকে নারীকে রক্ষা করার ব্যাপারটি অপ্রয়োজনীয়। আমরা এ ব্যাপারে হিজাব সংক্রান্ত কোরানের আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আলোচনায় যাবো। আমরা এটাও বলি না যে এ বিষয়টি এখন অপ্রাসংগিক এবং পুরুষের আক্রমণের বিরুদ্ধে নারীদের পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে। পাশ্চাত্য জগত নারী জাতির সাথে কি পরিমান অপরাধমূলক কাজ করছে তা খবরের কাগজ থেকেই জানা যায়।

প্রথম অধ্যায়ের টীকা

১. বার্টান্ড রাসেল 'Marriage & Ethies', পৃঃ৩০
২. ওয়াসাইল-আল- শিয়া, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২২৭
৩. ওয়াসাইল, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২২৭
৪. ওয়াসাইল, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২২৭
৫. ওয়াসাইল, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৭৮
৬. ওয়াসাইল, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৪, মুহাম্মদ ইয়াকুব, "কাফী"
৭. কোরান, ৭৪ঃ৪
৮. ওয়াসাইল, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৮০
৯. ওয়াসাইল, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৭৮
১০. কোরান, ৭ঃ৩২
১১. ওয়াসাইল, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৭৯
১২. ওয়াসাইল, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৩
১৩. কাফী, পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৫৬৭
১৪. নাহজ-আল-ফুসাহা
১৫. কাফী, পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৪৯৪
১৬. কাউন্ট গোভিনি, "ইরানে তিন বছর"

দ্বিতীয়অধ্যায়

হিজাব বিকাশলাভের কারণ

দ্বিতীয় অংশ

আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে হিজাব সংক্রান্ত বিষয়ে। কিন্তু যেমন আমরা আগেই বলেছি, প্রথমে আরো সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ইসলামের বাইরেও হিজাবের অস্তিত্ব রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে হিজাবের আবির্ভাব ঘটেনি। ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরব জাতিগুলো ছাড়া অন্য প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে হিজাবের প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারত ও ইরানে হিজাবের অস্তিত্ব ছিলো। ইসলামের হিজাব প্রথার চেয়ে প্রাচীন ভারত ও ইরানে প্রচলিত হিজাব প্রথা অনেক কঠোর ছিলো। আরব উপদ্বীপে ইসলামী হিজাব চালু করা হয়, এটা কোন অনুকরন ছিল না। অর্থাৎ আরব উপদ্বীপে ইসলাম হিজাব চালু করে কিন্তু অনারব জাতিগুলোর মধ্যেও বিশ্বব্যাপী এই প্রথা চালু ছিলো। এই প্রথাটির আবির্ভাবের পিছনে দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ দেখানো হয়েছে। এই কারণগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ঐ সময় হিজাব প্রথাটি চালু হওয়ার পিছনে কিছু বিশেষ অবস্থা কাজ করেছিলো। তখনকার জন্যে ঐ অবস্থাগুলোর প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু যখন বর্তমানে ঐ অবস্থাগুলোর অস্তিত্ব নেই তখন হিজাব প্রথা চালু থাকা উচিত কি না এ নিয়ে কথা উঠতে পারে। আমাদের দেখতে হবে, যে কারণগুলো উল্লেখিত রয়েছে তা কতটুকু সত্যি বা আদৌ সত্যি কি না, নাকি কিছু লোক যেভাবে মত পোষণ করে তা ঠিক যে প্রথম থেকেই হিজাব অন্যায়ভাবে নারীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। গত আলোচনায় আমরা দুটো কারণ উল্লেখ করেছি, এর একটি হচ্ছে নিরাপত্তার চিন্তা। এ কারণেই মহিলাদের জন্যে হিজাব প্রথা চালু হয়েছে বলে দাবী করা হয়। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বৈরাগী মনোভাব, অর্থাৎ যৌন কামনার সাথে সংগ্রামের চেতনার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের মানসিকতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসহ গোটা পৃথিবীব্যাপীই চালু ছিল। প্রাচ্যে এর কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্যে ছিল গ্রীস।

অর্থনৈতিক কারণ

কিছু লোকের ধারণা অর্থনৈতিক কারণে এবং মেয়েদের শোষণ ও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যে হিজাব বিকাশলাভ করে, সুতরাং এটা অন্যায়। তারা বলে, স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ চারটি যুগে বিকাশ লাভ করে যার একটি হচ্ছে বর্তমান সময়।

তাদের মতে মানব সভ্যতার প্রথম যুগ ছিলো সম্প্রদায়ভিত্তিক, বিশেষভাবে যৌণ সম্পকের ক্ষেত্রে। তার মানে পারিবারিক জীবনের কোনো অস্তিত্ব তখন ছিলো না। দ্বিতীয় যুগে পুরুষেরা নারীদের ওপর প্রভুত্ব করতো এবং মেয়েদেরকে পুরুষেরা তাদের ক্রীতদাসী হিসেবেই বিবেচনা করতো। দ্বিতীয় যুগটি তাই ছিলো পুরুষের প্রভূত্বের। তৃতীয় যুগে মেয়েরা পুরুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো এবং চতুর্থ যুগটি হচ্ছে এখন যখন নারী–পুরুষের সম–অধিকারের সময়। প্রথম যুগটি তাদের মতে প্রাগৈতিহাসিক সময়। দ্বিতীয় মালিকানার যুগটি ছিলো সবচে' দীর্ঘসময় যখন নারীদের ওপর পুরুষরা প্রভুত্ব করতো এবং তারা ইসলামকে এই যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছে। তৃতীয় যুগ যা প্রতিবাদের সময় হিসেবে পরিচিত সেটা ছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধাংশ। চতুর্থ যুগ হচ্ছে যা মোটামুটি এসে পড়েছে বা আসছে। এটা হলো নারী–পুরুষের সমান অধিকারের যুগ।

এটা সুস্পষ্ট যে, এই চারটি সময়কালের ধারণা নেয়া হয়েছে অর্থনীতি থেকে, যেখানে প্রথম সময়কালটাকে দেখানো হয়েছে গোত্রভিত্তিক, দ্বিতীয়টিকে সামন্তবাদী তৃতীয়টিকে পুঁজিবাদী এবং চতুর্থটিকে সমাজতন্ত্রী হিসেবে। তারা হিজাব আবির্ভাবের অর্থনৈতিক কারণ হিসেবে যে যুগকে উল্লেখ করে তার সঙ্গে অন্যদের উল্লেখিত অর্থনৈতিক স্তরগুলোর মিল নেই।

এভাবে উল্লেখিত চারটি সময়কালের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রথম যুগের এমন কোন তথ্য নেই যাতে করে এটাকে গোত্রভিত্তিক যুগ বলা যায়। এমন কোন প্রমাণ নেই যে একেবারে প্রথম থেকেই পরিবার প্রথা চালু ছিলো না।

আমরা এসব যুগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় যাবো না। আমরা শুধু সে বক্তব্যটির কথাই উল্লেখ করবো যেখানে তারা বলেছে হিজাব প্রথাটি চালু হয়েছে সেই সময়কাল থেকে যখন পুরুষ নারীর উপর তার প্রভাব খাটাতো। যদি আমরা ঐ যুগকে স্বীকার না করি তখন তারা বলে, পুরুষ মেয়েদের জন্যে দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ

হওয়ার কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুরুষ নারীকে নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ভাড়ায় খাটাত। সে নারীকে তার ঘরে রাখতো কাজ করার জন্যে। এটা ছিলো সেই সময়ের কথা যখন তারা ক্রীতদাসদের বন্দী করে রাখতো। পুরুষ দেখলো নারীকে ঘরে পর্দার আড়ালে রাখলে এবং তাদের বাইরে আসা–যাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে তাদের জন্যে ঘরে যে কাজ নির্দিষ্ট রয়েছে তা আরো ভালোভাবে তারা সম্পন্ন করতে পারবে। তাই পুরুষেরা এরকম করতো। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মেয়েদের ভাড়া করার পর তাদেরকে যন্ত্রে পরিণত করার জন্যে–ই এরূপ করা হতো, এরকমটি করার অন্য কোনো কারণ ছিলো না। যখনই হিজাব আবির্ভূত হয়েছে তখনই পুরুষরা তাদের ঘরের কাজে মেয়েদের নিয়োজিত রাখার পক্ষে একটা অজুহাত পেয়ে গেছে।

আমরা বলি না যে, পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এরকম অবস্থা বিরাজ করত না। নারীকে ঘরে বন্ধ রেখে অন্যদের সাহচর্য থেকে তাদের আলাদা করে রাখার মূলে অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমরা ইসলামী কারণ নিয়ে আলোচনা করছি। ইসলাম হিজাবকে এনে তাকে শুধু প্রতিষ্ঠিতই করেনি অন্যদিকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাষায় এটাও বলেছে যে, নারীদের থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের কোন অধিকার পুরুষের নেই। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে এবং এর উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে যে কাজই করুক না কেন তাতে নারীর স্বাধীনতা রয়েছে। প্রথমতঃ তার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আছে, পুরুষের তাকে যেকোনো কাজের নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকার নেই। যদি সে বলে "এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আমি এটা করবো" তাহলে সে অর্থ পাবার তার অধিকার রয়েছে। তার সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। যদিও নারীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে শিশুপালন তবু–ও সে অর্থ দাবী করতে পারে। তার প্রথম অগ্রাধিকার রয়েছে এই অর্থে যে, যদি মাসিক এক হাজার রিয়ালের জন্যে অন্য কোনো স্ত্রীলোক তার সন্তান পালন করতে রাজী হয় এবং সে নিজেও বলে যে এই এই কাজের জন্যে সে ১০০০ রিয়ালের বেশী নেবে না, সেখানে মায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে শিশুটিকে প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে, যদি না কোন কারণে অন্য স্ত্রীলোকটি বিশেষভাবে উপযুক্ত হয়।

যদি তা পারিবারিক পরিবেশে বিঘ্ন না ঘটায় তাহলে মেয়েদের বাইরে কাজ করার অধিকার রয়েছে। সে যা কিছু উপার্জন করে সেটা তারই, সে যে কাজই হোক না কেন। অবশ্য কাজটি আইনসংগত হতে হবে।

এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করার স্বার্থে হিজাবের ব্যবহারকে ইসলামী বিধান সমর্থন করে না। এ উদ্দেশ্য থাকলে

শরিয়তের বিধান থেকে তা বুঝা যেত। ইসলামী শরিয়ত তখন মহিলাকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে খাটানোর অধিকার পুরুষকে দান করত এবং বলত মহিলাকে অবশ্যই হিজাব পরিধান করতে হবে। এ রকম হলে দুটো জিনিসকে এক করে দেখা যেত। একটি জীবন বিধান একথা বলছে যে, মহিলাদের শোষণ করার অধিকার পুরুষের নেই এবং সাথে সাথে হিজাবের বিধান চালু করেছে। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে সে জীবন বিধান মহিলাদের অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে দমিয়ে রাখার জন্যে হিজাব প্রথা চালু করেনি।

পৃথিবীর যে সকল দেশে হিজাব প্রথা চালু ছিল সে সকল দেশে প্রধানতঃ এ কারণেই হিজাব চালু হয় বলেও আমরা মনে করি না। তবে ইরানে যারা হিজাবের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছেন তারা এ বিষয়টির উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। তারা লিখেছেন, মহিলাদের ঘরে রেখে শোষণ ও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে পুরুষরা মহিলাদের বন্দী করে রেখেছে। হিজাব প্রথা চালু হওয়ার কারণ হিসেবে তাদের পক্ষ থেকে এ কারণটি উল্লেখিত হয়েছে এবং আমরা বলেছি এ কারণ কোনভাবেই ইসলামী দৃষ্টিকোণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

নৈতিক কারণ

তাদের মতে, হিজাবের আবির্ভাবের আরো একটি কারণ হচ্ছে নৈতিক অর্থাৎ এটা ব্যক্তির মানসিকতা ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

তারা বলে, এটা এসেছে পুরুষের স্বার্থপরতা ও হিংসুটে মনোভাব থেকে। একজন পুরুষ একজন নারীর উপর কর্তৃত্ব করতো যাতে করে সে-ই শুধু তাকে ভোগ করতে পারে। শুধু যৌন ব্যাপারেই নয় অন্যান্য ব্যাপারেও তাকে যেন তার অধিকারভুক্ত নারীকে অন্য কারো সাথে ভাগাভাগি করতে না হয়। সে নারীর উপর তার প্রভাব এমনভাবে খাটাতে চাইতো যে, তাকে স্পর্শ করা এমনকি তাকে দেখাও যেন শুধু তার জন্যেই জায়েজ হয়। তার মানে এক ধরনের অতিরিক্ত লোভ পুরুষদের হিজাবকে সমর্থন করার পিছনে কাজ করতো।

রাসেল ঠিক একথাই বলেন। তিনি বলেছেন, মানব জাতি কিছুটা হলেও এভাবে তাদের ধনলিপ্সার উপর বিজয়ী হতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা দান-খয়রাতকে উৎসাহিত করেছে এং খাবার টেবিলে ভাগাভাগি করে খাওয়াকে সমর্থন করেছে। কারণ তা প্রচুর সম্পদশালী হওয়ার প্রমাণস্বরূপ। ধনসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত লোভ প্রদর্শনকে খারাপ চোখে দেখলেও তারা যৌনলিপ্সাকে দমন করতে পারেনি। তাই তারা নাম পরিবর্তন করে এর নাম দিয়েছে 'পৌরুষ' বা 'উদ্দীপনা'। তারা মনে করেছে হিংসা ও লোভকে এ নামে অভিহিত করলে তা ভাল গুণ হয়ে যাবে এবং ধন্যসম্পদের ব্যাপারে দান-খয়রাত যদি সৎগুণ হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে নারীদের ব্যাপারেও একই হিসাব প্রযোজ্য। খারাপ হলে তা উভয় ক্ষেত্রেই খারাপ হওয়া উচিত। এটা কেমন কথা যে, কোন লোকের কাছে সম্পদ থাকলে তা অন্যকে দেয়ার ব্যাপারে সহৃদয় ও সহনশীল হওয়া একটা ভাল কাজ এবং মহিলাদের ব্যাপারে একথা বললে তা হয়ে যায় পাপ? এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা ভাল হলে উভয় ক্ষেত্রেই ভাল এবং খারাপ হলে উভয় ক্ষেত্রেই খারাপ।

প্রথম কথা হল, 'সম্পদের মালিক হওয়া'র সাথে 'স্ত্রীর মালিক হওয়া'কে তুলনা করা অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হিংসা এবং উদ্দীপনা এক জিনিস নয়। এগুলো হচ্ছে দুটো ভিন্ন অনুভূতি। উদ্দীপনা হচ্ছে মানব সমাজের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটি

সামষ্টিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এমন একটি শব্দ যা মূলতঃ ব্যক্তি নয় বরং সমাজকেই সংরক্ষন করে থাকে। এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রহরীসদৃশ যা ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ মানব সমাজের মধ্যে স্থাপন করেছেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যৌনসম্ভোগ থেকে একজন পুরুষ যত আনন্দই অর্জন করুক না কেন এর ফলে তার 'উদ্দীপনা' নিস্তেজ হয়ে আসে এবং শালীনতাবোধ, দয়া ও নৈতিক ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কামুক পুরুষরা তাদের বিবেকবুদ্ধি এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যে, তাদের স্ত্রীরা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এটা থেকে তারা বরং একধরনের বিকৃত আনন্দই পায়। যারা তাদের নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তাদের ব্যাপার আলাদা। এই সংগ্রামে নিজেদের নৈতিক শক্তিকে সুসংবদ্ধ করে তারা তাদের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করে থাকে। সত্যিকার অর্থেই তারা তখন মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয়। এরপর তারা মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে। এ ধরনের মানুষের বেশী পরিমাণ উদ্দীপনা ও পৌরুষ থাকে এবং তারাই বেশী সতর্ক এবং রক্ষাকারী হয় মেয়েদের বেলায়। বাস্তবে সব স্ত্রীলোককেই রক্ষা করার একটা ইচ্ছা তাদের মধ্যে বিরাজকরে।

হযরত আলী (আঃ) বলেছেন, "একজন মহতি প্রেরণা সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না।" এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে তিনি বলেননি যে একজন সতর্ক বা হিংসুটে ব্যক্তি কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। কিন্তু একজন মহৎ প্রেরণা সম্পন্ন ব্যক্তির কথাই তিনি বলেছেন যে, সে কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ পৌরুষ হচ্ছে একটা মহৎ মানবীয় গুণ, এটা এমন একটা গুণ যা সমাজ এবং তার পবিত্রতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। যেমন একজন মহৎ প্রেরণা সম্পন্ন ব্যক্তি তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নারীদের অপবিত্র হতে দেবে না তেমনি সমাজের অন্যান্য স্ত্রীলোকের বেলায়ও তার একই মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হচ্ছে মহৎ প্রেরণা এবং ঈর্ষা বা সতর্কতা দুটো আলাদা জিনিস। ঈর্ষা হচ্ছে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং একধরনের মানসিক ধারনা থেকে এর উৎপত্তি। কিন্তু উদ্দিপনা বা প্রেরণা হচ্ছে একটা অনুভূতি এবং তা মোটামুটিভাবে পুরো মানব প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, পুরুষদের জন্য তাদের স্ত্রীদের অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে স্পর্শকাতরতা এমন একটা জিনিস যা স্রষ্টা প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন। তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণ করার জন্যে এটা প্রয়োজন এটা যদি না থাকতো, যদি শিশুদের জন্যে একধরনের অসাধারণ ভালোবাসা কাজ না করতো তাহলে একজন ব্যক্তির সন্তান উৎপাদনের আগ্রহও থাকতো না। যদি মানুষের মধ্যে

এক ধরনের বিবেচনা বোধ কাজ না করতো'যা' বীজের জায়গাটিকে রক্ষা করা এবং পাহারা দেওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় এবং যাতে করে অন্য কারো বীজ সেখানে না পড়ে তাহলে নারী–পুরুষের সম্পর্ক পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। সন্তান পিতাকে এবং পিতা সন্তানকে চিনতো না–যেখানে দুই প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে মানবসমাজের একটা নীতি। এটা না থাকলে সমাজ বলে কিছু থাকতো না।

মানুষকে একটা প্রবৃত্তি দেয়া হয়েছে যা সমাজ সংরক্ষণের ভিত্তিস্বরূপ এবং এটা হচ্ছে ভবিষ্যতের বংশধরদের সংরক্ষণ করার আকাঙ্খা। নারী–পুরুষ উভয়েরই সে আকাঙ্খা রয়েছে। সেজন্যই নারীকে হেফাজতে রাখার কথা বলা হয়। শিশু জন্মালে সে তার মাকে এবং মাও তার শিশুকে জানে। কিন্তু পুরুষের বেলায় এরকম কোনো নিশ্চয়তা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এমন সাবধানতা অবলম্বন করে যাতে করে তারা তাদের পিতৃত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।

কেউ কি বলতে পারে যে, তাদের প্রেরণা বা উদ্দীপনা নামক যে প্রবৃত্তিটি রয়েছে তা বর্জন করতে হবে এবং এটা কি "ঈর্ষার" মতোই একটা জিনিস? যারা সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীভিত্তিক জীবন যাপনের কথা বলে তারাও মেয়েদের প্রসঙ্গে আলোচনায় দুটো জিনিসকে এক করেনি।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ

কিছু কিছু মানুষের ধারণা হিজাবের মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। শুরু থেকেই পুরুষদের ব্যাপারে মেয়েরা একধরনের হীনমন্যতায় ভোগে। এর কারণ হচ্ছে দুটি। প্রথমতঃ কিছু কিছু মহিলার ধারণা পুরুষের তুলনায় তাদের শরীরে কিছুর ঘাটতি রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় এবং সন্তান জন্মের পর রক্ত নির্গত হওয়া। প্রাচীনকালে মাসিক ঋতুস্রাবকে একধরনের ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা হতো। তাই সে সময় মেয়েদের আলাদা করে রাখা হতো এবং প্রত্যেকেই তাদের এড়িয়ে চলতো।

হয়তো প্রধানতঃ এ কারণেই এ বিষয়ের ওপর মহানবী (দঃ) কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো। এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ পাক একটি বিশেষ আয়াত নাজিল করেন। ঋতুস্রাব দোষণীয়, মেয়েদের এ সময়ে আলাদা করে রাখা উচিত অথবা এ সময়ে কারোর সঙ্গে তাদের মেলামেশা করা উচিত না–এধরনের কোন কথা পবিত্র কোরআনে নেই। কোরআন শরীফ বলে, এটা একধরনের প্রক্রিয়া যাতে শরীর থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ বেরিয়ে যায় এবং এ সময়ে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া তাদের উচিত নয়। কোরআন শরীফে এটা লেখা নেই যে, ঋতুস্রাবের সময় অন্যরা তাদের এড়িয়ে চলবে। ''তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, ''এটা এক ধরনের ক্ষতিকর জিনিস। নারীদের সঙ্গে এ সময় সহবাসে লিপ্ত হয়ো না।'' (২ঃ২২২)। কোরআনের আয়াত অনুসারে এটা এক ধরনের ক্ষতিকর জিনিস যা অন্য সব বর্জ্য পদার্থের মতই এবং এ জন্যে পরিতাপ করার কিছু নেই।

আবু দাউদ নবীজীর এক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইবনে মালেক বলেছেন, ইহুদীরা ঋতু স্রাবের সময় তাদের স্ত্রীগণকে বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দিত। তারা ঐ সময় স্ত্রীদের সাথে খাওয়া–দাওয়া থেকে আরম্ভ করে একই গ্লাসে পানি পর্যন্ত পান করতো না। এমনকি স্ত্রীদের সাথে একই ঘরে বসবাস পর্যন্ত করতো না।" এই বিষয়ে নবীকে (সঃ) প্রশ্ন করলে উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। নবী (সঃ) নারীদের এ সময় আলাদা করে রাখার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলছেন, ''কোন কিছুই নিষিদ্ধ নয়, শুধু সহবাস থেকে দূরে থাকো।'' ইসলাম ধর্মমতে, একজন রজস্বলা নারী হচ্ছে মুহদিস, যিনি নিজেকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পাকসাফ রাখতে পারেন না। ঐ সময় তারা নিয়মিত রোজা এবং নামাজ থেকেও বঞ্চিত থাকে। প্রত্যেক হাদাস শরিয়তের দিক দিয়ে এক ধরনের অপবিত্রতা, যা শুধুমাত্র অজু গোসল দ্বারা দুরীভূত করা যায়।

এ দ্বারা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে স্বপ্নদোষ বা যৌন সঙ্গমের মতই এটা এক ধরনের অপবিত্রতা। এ ধরনের অপবিত্রতা শুধু মহিলাদেরই হয় না এবং অজু-গোসলের মাধ্যমে তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

এ বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত ছিল। যেমন নারীদের ঋতুস্রাব এক ধরনের মানসিক অযোগ্যতা থেকে জন্মে এবং এ কারণেই নারী-পুরুষ উভয়েই চিন্তা করতেন যে, নারীরা নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন। তাদের এ ধারণা সঠিক কি ভুল, তার সাথে ইসলামী দর্শন এবং হিজাব (পর্দা) অথবা আচ্ছাদনের কোন সম্পর্ক নেই। ঋতুস্রাব বা হিজাব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ইসলামী বিধান কোথাও নারী জাতিকে নিম্নমান সম্পন্ন বলে উল্লেখ করেনি।

এই পাঁচটি কারণ ছাড়া বাকী কারণগুলো এগুলোর সাথেই কমবেশী সম্পর্কযুক্ত। এ পাঁচটি কারণ নিয়ে আলোচনা না করে একথা বলা উচিৎ নয় যে বর্তমানে হিজাবের প্রয়োজন নেই অথবা প্রথম থেকেই হিজাব ছিল একটা জুলুম।

হিজাবের কি অন্য কোন কারণ আছে? আমরা এ সত্য উপস্থাপিত করতে চাই যে, ইসলাম ধর্মে হিজাবের পেছনে অন্য কারণ আছে যা উল্লেখিত পাঁচটির কোনটির সাথে তুলনা করা যায় না। এবং তা হচ্ছে, একজন ব্যক্তির নিজের, পরিবারের এবং সমাজের কল্যাণসাধন।

এটা সবার জানা যে মানুষের আত্মার অবস্থা একজন ব্যক্তির শরীরের মত। এটা ভাল কিংবা মন্দ হতে পারে। এর অসুস্থতার কি কারণ থাকতে পারে? অনেকে অনেক কারণ দর্শিয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নৈরাশ্য, আকাঙ্খা পূরন না হওয়া, বঞ্চনা ও ব্যর্থতা।

কোন কোন লোক বলেন, যৌন নৈরাশ্য এবং সামাজিক সীমাবদ্ধতা থেকে এর জন্ম। এ সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারলে যৌন ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাগুলোর সফল বাস্তবায়ন হবে এবং যৌন নৈরাশ্য দূরীভূত হবে। সত্যিকার অর্থে এরূপ ধারণা পরবর্তীতে বিপাকে ফেলে। একথা পরিষ্কার যে যৌন হতাশা মানসিক অসুস্থতার কারণ হলেও যৌন স্বাধীনতা দিয়ে মানসিক অসুস্থতা দূরীভূত করা যাবে না। আমরা বরং এর মাধ্যমে যৌন আকাঙ্খাকে বাড়িয়ে দেব। যৌন আকাঙ্খা বৃদ্ধির ফলে মানব জাতিকে আরো হতাশার মধ্যে ঠেলে দেয়া হবে মাত্র।

এটা বলা যায় যে, খাদ্য বিষয়ক চাহিদার বিচারে একজন মানুষের চাহিদা খুব সীমিত। সমাজে খাদ্য চাহিদার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। যদি কোন দেশের

জনসংখ্যা ২ কোটি হয় তাহলে খাদ্যের পরিমাণ সেই হারেই প্রয়োজন হবে। যদি তাদের খাদ্য সরবরাহ চাহিদার তুলনায় বেশী হয় তাহলে তারা এটা ফেলে দেয়।

অনেক সময় চাহিদা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও তারা সন্তুষ্ট থাকে। এমনকি সরবরাহের উপর নির্ভর করে চাহিদা কমে যেতে পারে। কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে, কোন কোন জিনিসের ব্যাপারে মানুষের চাহিদার শেষ নেই।

আমরা বলতে চাই, একটি সমাজে কতটুকু খাদ্য প্রয়োজন তা গণনা করা বা ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু যদি এ প্রশ্ন হয় যে, একটি সমাজে কতটাকা দরকার, তাহলে সেক্ষেত্রে চাহিদাটা হবে সীমাহীন।

আমরা যদি প্রশ্ন করি ''ইরানের জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে কতটুকু গম প্রয়োজন? এটা নির্ধারণ করা ও পরিমাপ করা খুবই সহজসাধ্য। কিন্তু নির্ধারণ করা তখনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে যদি আমরা প্রশ্ন করি এদেশে জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে কত টাকার প্রয়োজন হবে? কোন লোককে আলাদাভাবে যত সম্ভব টাকা দেয়া হোক না কেন সে কখনোই বলবে না ''এটা আমার জন্য যথেষ্ট''। জ্ঞানও ঠিক তদ্রুপ।

মানব জীবনের অনেক চাহিদার ভিত্তি হচ্ছে মানুষের সীমাহীন আকাঙ্খা। যখন আপনি এ ধরনের কিছু সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন তখন একজন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত বলে যাবে, ''আমি আরো চাই''। সম্পদ ঠিক এরূপ। এটা কখনও পরিতৃপ্তি আনতে পারে না। এ প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ) বলেছেন, ''মানুষের দুই ধরনের ক্ষুধা রয়েছে যা কখনোই পরিপূর্ণ হয় না, জ্ঞানের ক্ষুধা ও সম্পদের ক্ষুধা''।

কেহ কি একজনের আকাঙ্খা পুরোমাত্রায় মেটাতে পারে? কিংবা একটা সমাজ কি তা পারে? না, কোন ব্যক্তি এক অবস্থানে থাকলে, সে চায় তার চেয়ে আরো ভাল অবস্থানে যেতে। এমনকি তাকে যদি সর্বোচ্চ অবস্থানেও বসানো হয় তবুও সে পরিতৃপ্ত হবে না। মানুষের সীমাহীন আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানব জাতিকে বিরোধ ও জটিলতা মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। শারীরিক দিক থেকে যৌন আনন্দ সীমিত। একজন মানুষ একজন স্ত্রী হতে পরিতৃপ্তি পেতে পারে, বেশী হলে হয়তো দু'জন স্ত্রীর দরকার হবে। কিন্তু একজন পুরুষের একজন রমণীর প্রতি যে আকর্ষণ তৈরী হয় তা দৈহিক মিলন থেকে ভিন্ন। রাসেলও একথা স্বীকার করেছেন। নারীসঙ্গের প্রতি একজন পুরুষের আকর্ষণ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে তখন কি তা পূরণ করা সম্ভব? একজন পুরুষ; যে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, মনে করুন তার নিজ

হারেমে হাজার হাজার সুন্দরী মহিলা আছে। তাকে যদি কেউ বলে, 'অমুক স্থানে একজন সুন্দরী মহিলা আছে,' তাহলে কি সে বলবে, 'না, আমি আমার হারেম নিয়ে সন্তুষ্ট', 'আমি হারেমের মেয়েদের সাথেই শুধু সম্পর্ক রাখতে চাই'? অর্থাৎ এ ব্যাপারে কখনো কেউ পরিতৃপ্ত নয়।

এ কারণেই তারা যৌন আকাঙ্খাকে ধনসম্পদের আকাঙ্খার মত মনে করে। এসকল আকাঙ্খা পূরণযোগ্য নয়। তারা এ ব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্যও রেখেছে। মানব জীবনকে এ পথ থেকে অবশ্যই বিচ্যুত করতে হবে। মানুষকে এমন একটি পথে দাঁড় করাতে হবে যে পথের কোন শেষ নেই। এ বক্তব্য ফ্রয়েডের। প্রথমে ফ্রয়েড সব ধরনের সামাজিক বিধি–নিষেধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তারপর তিনি দেখলেন, মানুষকে সীমাহীন যৌন স্বাধীনতা দেয়ায় আরো বেশী সমস্যা ও জটিলতার উদ্ভব ঘটেছে এবং তা অনেক বড়বড় মনস্তাত্ত্বিক অসুবিধার জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি বলেন, ''মানুষের এ প্রেরণাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে করে তারা চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতি কাজে মানসিক দিক দিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে এবং তা সম্ভবপর।'' কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে এ প্রেরণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অভিজ্ঞতা এবং পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে খুব বেশী যৌন স্বাধীনতা রয়েছে এবং কোন কোন এলাকায় এর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যার ফলে সে সব এলাকায় মানসিক অসুস্থতা অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করেছে এবং দিনের পর দিন যৌন কামনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা' আগুনের লেলিহান শিখার ন্যায় বেড়েই চলেছে। কেউ কি জ্বালানী ব্যতীত আগুনকে সন্তুষ্ট করতে পারে? এটা অসম্ভব। কিন্তু কি করে মানব জাতিকে এ থেকে রক্ষা করা যায়? মানুষের লালসা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে, এটা সত্য। কিন্তু একটা কথা লক্ষণীয় যে মানব জাতির প্রলোভন এমন জিনিসের প্রতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নিষিদ্ধ এবং সেদিকে তাদের প্রলুব্ধ করা হচ্ছে। যদি প্রলোভন না দেখানো হয় অথবা কম প্রলোভন দেখানো হয়, তাহলে এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমে যায়। যৌন প্রলোভন অব্যাহতভাবে চললে যত যৌন স্বাধীনতাই দেয়া হোক না কেন কারো পক্ষেই আকাঙ্খা পূরণ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং যদি এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং যৌন প্রয়োজন বৈবাহিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করা হয়, সমাজে যদি কাজ ও কর্মস্পৃহা বিদ্যমান থাকে, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী তৎপরতা চালানোর অধিকার মহিলাদের যদি না থাকে এবং পুরুষের যদি বিবাহের বাইরে যৌন আকাঙ্খা পূরণের সুযোগ না থাকে তাহলে মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি অধিকতর সহজ ও সুন্দরভাবে হবে।

পারিবারিক দিক সম্পর্কে বলতে গেলে বৈবাহিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ ও মধুর করার জন্যে সম্ভাব্য সকল পন্থায় প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যে সকল কাজ এ সম্পর্ককে দুর্বল করে তা প্রতিরোধ করতে হবে। যৌন আনন্দ পাওয়ার আঙ্খাকে বিবাহের মধ্যে সীমিত রাখা হলে, সে আনন্দ যে পরিমাণই হোক, বিবাহিত দম্পতিকে আরো গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। কেননা যে পুরুষ জানে একমাত্র তার স্ত্রীই তাকে তৃপ্তি দিতে পারে এবং যে নারী জানে একমাত্র স্বামীই তার আনন্দ ও সুখের উৎস এমন নারী–পুরুষের মধ্যে গভীর ও মজবুত বন্ধন হতে বাধ্য।

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে, একজন পুরুষের জন্য স্ত্রী ব্যতীত এবং একজন স্ত্রীর জন্য স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কেন? কেন তাদের যৌনসঙ্গী থাকবে না? এখানে প্রভেদ রয়েছে। যে সমাজে ইসলামী বিধান মেনে চলা হয় সেখানে একটি বালিকা বালেগ হওয়ার পর যে কোন তরুণের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ নেই– যদিও তাদের মধ্যে সহজাত যৌন আকাঙ্খা বিদ্যমান রয়েছে। যখন একটি ছেলে সাবালক হয় তখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা আকর্ষণ ও অনুরাগ সে অনুভব করে। কিন্তু তা পূরণের সুযোগ তার নেই। মনে করুন তাকে বলে দেয়া হয়েছে, যখন সে ২০ বছরে পা রাখবে তখনই সে বিয়ে করতে পারে এবং বালিকা জানে যে, সে অল্প বয়সের মধ্যে বিয়ে বসতে পারে। বৈবাহিক বন্ধন তখন তাদের কাছে একটি মধুর ও আনন্দকর বিষয় বলে মনে হয়। সংযত জীবন যাপনের পর বিয়ের মাধ্যমে তারা একটা আকাঙ্খা পূরনের সুযোগ লাভ করে। একজন যুবক যখন প্রথম কোন যুবতীকে স্ত্রী হিসেবে পায় তখন তার মনে এমন কামনা–বাসনার উন্মেষ ঘটে যে এ মেয়েটিই তাকে আনন্দ দিবে ও সুখী করে তুলবে। একজন যুবতীও যখন একজন পুরুষের মুখোমুখি হয় তখন সেও মনে করে যুবকটি তার জন্যে সুখ–সমৃদ্ধি ও আনন্দ বয়ে আনবে। এ অনুভূতির সাথে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। বিবাহ ও পরিবার এইভাবে আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিবাহ সীমানার বাইরে যৌন আকাঙ্খা পূরণ নিষিদ্ধ থাকলে বিবাহ সুখের কেন্দ্র হয়ে উঠে।

যৌন পরিতৃপ্তির ব্যাপারে পরিবারের বাইরে এ ধরনের বিধিনিষেধ থাকাতে পরিবারের সংহতির ভিত্তি উত্তরোত্তর মজবুত হতে থাকে। যদি পরিবারের বাইরে অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেয়া হয়, তাহলে পরিবারের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ইসলামী হিজাব যৌন প্রয়োজনকে বিবাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। অনেকে বলে হিজাব সমাজের অর্ধেককে বিকলাঙ্গ করে থাকে। আমার মনে হয়, উল্লেখিত হিজাব ভারতবর্ষ অথবা প্রাচীন ইরানের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইসলামী হিজাব এ কথা

বলে না যে, মহিলারা গৃহবন্দী হয়ে থাকবে। এ কথাও বলে না, তারা বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে না এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ইসলাম ধর্মমতে একজন মহিলা অবশ্যই বাড়ীর বাইরে বেরুতে পারবে। কিন্তু এমনভাবে চলাফেরা করবে না, যার ফলে অন্য পুরুষেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এটাই প্রত্যেক মহিলাদের করণীয় ও পালনীয়। যে মহিলা বাড়ীর বাইরে যায় তাঁর দিকে কোন পুরুষেরই লোলুপ দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়। এটা পুরুষের জন্য নীতিগতভাবে অবশ্যইপালনীয়।

বিভিন্ন সামাজিক কাজে মহিলারা প্রলুব্ধ হওয়ার মত কণ্ঠে যদি কথা না বলতো, তাহলে ছেলে-মেয়েরা কি একত্রে ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারতো না? পুরুষেরা যদি মেয়েদের সাথে হাসি তামাসা করা থেকে বিরত থাকতো তাহলে সমাজ কি আরো ভালোভাবে এগিয়ে যেতো না? ইসলামী হিজাবের প্রচলন হলে মানুষ অধিকতর যোগ্যতার সাথে তার কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারবে এবং এভাবে বিপণন তৎপরতায়ও উন্নতি হবে।

এটা পরিষ্কার যে মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ উন্নয়নশীল কাজকর্মের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের লেখাপড়া হচ্ছে না। বিপণনের কাজ হল ভাল সামগ্রী বিক্রি করা। কিন্তু সে কাজ থেকে আজ বিপণন ব্যবস্থা বিচ্যুত। সুন্দরী নারী প্রদর্শন করে জনগণের পকেট খালি করে দেয়া হচ্ছে। মানুষ কিনতে যায়, কিন্তু দেখে না কি কিনছে। বরং সুন্দরী নারীর সাথে কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করে। এসব দ্বারা সমাজ কি বিচ্যুতির পথে যাচ্ছে না?

সুতরাং কাজ, সামাজিক তৎপরতা ও উন্নয়নের দাবী হচ্ছে সমাজ যেন যৌনকামনা জাগ্রত করা ও যৌন আকাঙ্খা পূরণের ক্ষেত্র হয়ে না পড়ে। ইসলামী হিজাব এ দায়িত্বই পালন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা

১. 'সুনান-ই- আবি দাউদ' হাইদ, পৃঃ ১০২

২. 'সুনান-ই- আল দারামী', মোকাদ্দমা, পৃঃ ৩২

তৃতীয়অধ্যায়

ইসলামী হিজাব প্রথম অংশ

হিজাব নারীকে মর্যাদা দান করে

একটি বিষয় আলোচনা করা হয়নি। হিজাব বা পর্দার বিরুদ্ধে একটি প্রচলিত সমালোচনা রয়েছে। তাহলো, পর্দা নারীদের প্রত্যাশিত সম্মান থেকে বঞ্চিত করে। আপনারা জানেন মানবাধিকার সম্পর্কে কথাবার্তা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অধুনা মানবীয় মর্যাদা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যথাযথভাবে এই মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নারী–পুরুষ, সাদা–কালো জাতি বা গোত্র–নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তি এই মানবীয় মর্যাদার অধিকারী। উক্ত সমালোচনাকারীদের মতে, ইসলামী পর্দা ব্যবস্থা মানবীয় মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। তাদের মতে, আমরা মানবীয় মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করছি অথচ ইসলামী পর্দা ব্যবস্থা নারীদের প্রকৃত মর্যাদার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল। পর্দা নারীকে দাস করে, পর্দা নারীকে বন্দিনী করে। ক্রীতদাস প্রথা মানুষের মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাদের মতে, পুরুষেরা নারীদের ঠকানোর জন্যই এই হিজাব বা পর্দা প্রথার প্রচলন করেছিলো। পুরুষেরা সব সময় নারীদের গৃহবন্দী রাখার জন্য এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিলো। সুতরাং এটা দ্বারা নারীদের মানবীয় মর্যাদাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বস্তুতঃ একজন নারীর প্রকৃত শ্রদ্ধা ও মহত্ত্বকে বজায় রাখার জন্য হিজাব বা পর্দা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

আমরা বলেছি এবং পরবর্তীতে বর্ণনা করবো যে, আমরা পবিত্র কোরআন থেকে প্রমান করব, ইসলামী হিজাব মহিলাদেরকে গৃহবন্দী করে না। যদি একজন মহিলা তার স্বামীর সাথে সৎভাব বজায় রাখে বা একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে সৎভাব বজায় রাখে তাহলে পরিবারের সংহতি ও বন্ধন অধিকতর দৃঢ় হয়, এটা একটি পরিষ্কার সিদ্ধান্ত। সামাজিক প্রেক্ষাপটে একথা বলা যায় যে, এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণের দাবী হচ্ছে, একজন পুরুষ এবং একজন রমণী তাদের নিজেদের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের সাহচর্য বজায় রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে। অন্য কথায়, তাদের মধ্যে থাকতে হবে নৈতিক পবিত্রতা ও ভারসাম্য। সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার দাবী হল, নারী ও পুরুষ একে অপরের সাথে

মেলামেশার জন্যে একটি বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করবে। তা অবরোধ নয়, বন্দীত্ব নয় এবং তা মানবতা বিরোধীও নয়।

আমরা দেখি, যদি একজন মানুষ উলঙ্গভাবে বাড়ী ত্যাগ করে তাহলে সে দোষী সাব্যস্ত ও নিন্দিত হয় এবং সম্ভবত পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে। যদি কখনও একজন মানুষ পায়জামা বা আন্ডারপ্যান্ট পরে তার বাড়ী ত্যাগ করে তবে প্রত্যেকে তাকে থামাবে। কারণ এটা সামাজিক মর্যাদার পরিপন্থী। নিয়ম বা প্রচলিত আইন হচ্ছে কেউ যখন বাড়ির বাইরে যাবে তখন পরিধেয় পরে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে যাবে। তাকে এ কথা বলা কি মানবতা বিরোধী যে 'তুমি কাপড় পরিধান করে বাইরে যাও?'

অন্যদিকে একজন মহিলা যদি আবৃত অবস্থায় বাড়ী থেকে বের হয় তাহলে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়। যারা নৈতিকতাবোধ হারিয়ে ফেলে তাদের পথে তা বাধা হিসেবে কাজ করে। যদি একজন মহিলা আবৃত অবস্থায় বাড়ী থেকে বের হয়, তাহলে মোনবতার অপমান হয় না, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মনে করুন একজন মহিলা শুধুমাত্র তার মুখ ও দুটো হাত খোলা রেখে ঘর থেকে বেরুলেন এবং তার ব্যবহার ও তার পরনের কাপড় এমন নয় যে তিনি এসব দ্বারা অপরকে তার প্রতি আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে তার দিকে আহবান করছেন না। যে কাপড় নিজেই অন্যকে ডাক দেয় সে রকম কোন কাপড় তিনি পরেননি, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত ভঙ্গীতে তিনি হাঁটছেন না এবং অপরকে আকৃষ্ট করার মত ভাষায় তিনি কথাও বলছেন না। অনেক সময় মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা থেকে তার আসল রূপ বেরিয়ে আসে।

অনেক সময় অনেক মানুষ এমন সব কথা বলে ও পোশাক পরিধান করে যেন বলতে চায় "আমাকে ভয় পাও"। ঠিক এর বিপরীতে রয়েছে চির প্রচলিত পোশাক যেমন ঢিলা জামা, দাড়ি এবং পাগড়ী ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে বুঝানো হয় "আমাকে শ্রদ্ধা কর।" একজন নারীকে সম্মান দেয়া মানে, একজন পুরুষকে সম্মান করা, বা একটা সমাজকে সম্মান করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একজন নারীকে এমন কোন চাকচিক্য ও অশালীন পোশাক পরিধান করা উচিত নয় যা পথিককে আকর্ষণ করে। একজন রমণীর এমনভাবে চলা উচিত নয় যাতে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সে যে কাজ করছে তা থেকে তার মনযোগ নষ্ট হয়। এটা কি নারী জাতির জন্যে অপমানজনক? অথবা এতে কি সমাজের মর্যাদা বিনষ্ট হয়? যদি কেউ বলে, 'হিজাব' অর্থ হচ্ছে মেয়েদের বন্দী করে রাখা, অর্থাৎ একজন নারীকে আবদ্ধ ঘরে

বসবাস করতে হবে এবং সে ঘরের বাইরের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না, তাহলে তার একথা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অবশ্য প্রাক-ইসলাম যুগে এ ধরনের অবস্থা ছিল। ইসলাম যদি বলত, মহিলাদের জন্যে বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই; মহিলারা বাইরে গিয়ে পুরুষ দোকানীর নিকট থেকে কোন জিনিস খরিদ করতে পারবে কিনা- এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমরা যদি বলতাম, না, পারবে না; মহিলারা সভা-সমিতি বা ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিতে পারবে কিনা তা জিজ্ঞাসিত হলে আমরা যদি বলতাম, না, পারবে না; মহিলারা একে অন্যের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে যদি বলা হত, না, পারবে না; অর্থাৎ একজন মহিলাকে ঘরের কোণে বসে থাকতে হবে এবং ঘর থেকে কখনো বের হতে পারবে না-ব্যাপারটা যদি এ রকম হত তবে ছিল ভিন্ন কথা। কিন্তু ইসলাম এভাবে নির্দেশ দেয়নি।

আমরা বলি, এটা দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। একটি পরিবারের কল্যাণের সাথে জড়িত। স্ত্রী লোকের এমন কিছু করা উচিত নয় যা পরিবারের শান্তি বিঘ্নিত করে। একজন মহিলার তার সে বোনের বাড়ী যাওয়ার আশা ত্যাগ করা উচিত যে বোন অসতী এবং মায়ের বাড়ীতেও তখন যাওয়া উচিত নয় যখন সেখানে গেলে পরিবারে সপ্তাহব্যাপী বিশৃংখলা লেগে থাকে। দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে কিভাবে বাইরে যাওয়া হচ্ছে। নিজেকে প্রদর্শন করার জন্যে অবশ্যই তা হবে না। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে, এমনভাবে বুক ফুলিয়ে চলা উচিত নয় যা অন্যের শান্তি ভঙ্গ করে এবং অন্যের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। এ অসুবিধাগুলো না থাকলে বাইরে যাওয়া কোন সমস্যাই নয়।

কারো বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ

এখন আমরা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। তারপর প্রাচীন তাফসিরকারকগণ এ সকল আয়াতের কি ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখব। এরপর আমরা এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস এবং ফকীহ্‌গণের রায়ের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব। হিজাব সংক্রান্ত আয়াত সূরা নূর ও সূরা আহযাবে বর্নিত হয়েছে। আমরা তার সবটাই উল্লেখ করবো। আমরা আমাদের আলোচনা আরম্ভ করবো সূরা নূরের আয়াত দিয়ে। এই আয়াতগুলো হিজাবের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। আয়াতগুলো সূরা নূরের ৩০ ও ৩১ আয়াত। কিন্তু এর পূর্বের তিনটি আয়াতকে কমবেশী হিজাবের ভূমিকা বলা যায় এবং এটা হিজাবের সাথে সংশ্লিষ্ট।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপাদেশ গ্রহন কর।" (২৪ঃ২৭)[১] এ আয়াতে একজন গায়র মাহরাম পুরুষের জন্যে অপর লোকের বাড়িতে প্রবেশের নিয়ম বলে দেয়া হয়েছে, (অর্থাৎ সেই লোকের বাড়িতে যার স্ত্রী তার জন্যে মাহরাম নয়)। অবশ্য মাহরাম পুরুষের জন্যেও কারো বাড়িতে প্রবেশের নিয়ম-কানুন রয়েছে। আমরা পরে তা আলোচনা করব। কোন কোন জায়গায় এ নির্দেশ শুধু মাহরামদের জন্যে সুনির্দিষ্ট নয়। যে কোন লোক যে কোন ঘরে প্রবেশ করতে হলে এ নিয়ম মেনে চলতে হবে।

শুরুতেই আমাকে বলতে হবে, কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে অন্ধকার যুগে কি অবস্থা ছিল। বর্তমান যুগের মত তখন বাড়ীঘর ছিল না। তালার ব্যবহারও ছিল না, দরজা শুধু চোরের কারণেই বন্ধ রাখা হতো। যদি কেউ কারো বাড়ীতে প্রবেশ করতে চাইতো সে দরজার ঘন্টা বাজাতো বা দরজায় আঘাত করতো। এখানকার যুগেও গ্রামের বাড়ীতে মানুষের দরজা সর্বদা খোলা থাকে। অনেক জায়গায় তালারও ব্যবস্থা নেই। তেহরানের নিকটে ফারমিন নামক একটি গ্রামে আমি বসবাস করতাম। সেখানকার খুব কম বাড়ীতেই দরজা-জানালা লাগানো হয়, কারণ সেখানে চোর নেই বললেইচলে।

ইতিহাস হতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে মক্কায়, প্রায় বাড়ীরই দরজা রাখা হতো না। ইসলামের আইন অনুসারে একজন ব্যক্তি এককভাবে মক্কার বাড়ীগুলোর অধিকারী

হতে পারে না। এই ব্যাপারে অবশ্য ফকীহদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। ইমামগণ এবং শাফেয়ী মতালম্বীগণ মক্কার ব্যাপারে এই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, কেহ সেখানে এককভাবে জমির মালিক হতে পারে না। মক্কার জমির উপর সকল মুসলমানের সমান অধিকার আছে। এখানকার জমি কেনা–বেচা করা যায় না। এখানকার বাড়ীগুলো সকল জনসাধারণের। এর হুকুম মসজিদের ন্যায়। সূরা হজ্জে বলা হয়েছে, স্থানীয় ও বহিরাগত সবাই এ ব্যাপারে সমান।

আজকের যুগে মক্কার লোকেরা বাড়ি ভাড়া বাবদ যে টাকা আদায় করে তা শিয়া ফেকাহ যেমন অনুমোদন করে না তেমনি তা বহুলাংশে সুন্নি ফেকাহ সম্মতও নয়। এ ব্যাপারে অবশ্যই একটা আন্তর্জাতিক রুলিং থাকা দরকার। সেখানে প্রবেশাধিকার সীমিত করা এবং কারো প্রবেশের পথে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত কামরার মত। মসজিদে কারো কামরা থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে প্রবেশের পথে কাউকে বাধা দেয়া যায় না। খালি কামরার দরজা বন্ধ করে রাখার অধিকার কারো নেই। অবশ্য কেউ যদি সে কামরা ব্যবহার করে তাহলে তার সে অধিকার রয়েছে।

জানা যায়, মুয়াবিয়া প্রথমে বাড়ীতে দরজা স্থাপন করেন। মক্কার বাড়ীতে এগুলো লাগানো নিষিদ্ধ ছিল। এটাই ছিল সাধারণ অবস্থা। আরবের অন্ধকার যুগে এ প্রথা ছিল না যে, কারো বাড়ী যেতে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। তারা অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করাকে অপমানজনক মনে করতো। কোরআনের অন্য এক আয়াতে উল্লেখ আছে ''তুমি যদি অনুমতি প্রার্থনা কর এবং না পাও তাহলে ফিরে যাও।'' এটা কারো দৃষ্টিতে অপমানিত হওয়া, মনে হতে পারে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে এর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। এটা হিজাব সংক্রান্ত বিধানের অংশ। কেননা প্রত্যেক মহিলা তার নিজ ঘরে এমন অবস্থায় থাকে যে সে চায় না সে অবস্থায় কেউ তাকে দেখুক এবং সেও কাউকে সে অবস্থায় দেখতে চায় না। কোরআনের আয়াতে উল্লেখ আছে যে ''যখন তুমি তার স্ত্রীদের কাছে কোন কিছু চাও তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও'' (৩৩ঃ৫৪)। সুতরাং কেউ কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে তার অনুমতি চাইতে হবে এবং মালিকের অনুমতি পেলে প্রবেশ করা যাবে। আপনি যে প্রবেশ করতে চান তা ঘরের মালিকের জানা থাকলেও আপনাকে অনুমতি নিতে হবে।

নবী করীম (দঃ) বলেন, ''তোমরা কারো গৃহে প্রবেশের সময় আল্লার নাম উচ্চস্বরে উচ্চারণ করবে।'' আমি পরবর্তীতে 'ইয়া আল্লাহ' শব্দটির ব্যাখ্যা বুঝতে পেরেছিলাম, যা' মুসলমানেরা পরের বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে উচ্চারণ করে থাকে। এটা

আসলে উক্ত আদেশেরই বাস্তবায়ন। এটা কতই না উত্তম যে আল্লাহর নাম উচ্চারণের মাধ্যমে উপস্থিতি ঘোষণা করা হয়। রাসূল (দঃ) এটা সর্বদা নিজে করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, ''আমাদের মাতা, বোন কিংবা কন্যাদের বাড়ীতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও কি একই নিয়ম প্রযোজ্য।?" তিনি বললেন, ''তোমাদের মাতা যখন পোশাক খুলে রাখেন তখন কি তিনি তোমাদের দেখা দিতে চান? তারা বললেন ''না।'' অতঃপর নবী (দঃ) বললেন, একই নিয়ম মাতৃগৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। যখন নবী করীম (দঃ) কোন গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়াতেন এবং এমন স্থানে দাঁড়াতেন যেখান থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তিনি বলতেন–'আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত।' তিনি আরো বলেন, ''তোমরা যদি কোন উত্তর বা সাড়া না পাও তবে মনে করবে ঐ ব্যক্তি তোমার কণ্ঠ শোনেনি। পুনরায় উচ্চস্বরে ডাক। তাতেও যদি কোন সাড়া না পাও তবে ধরে নিবে ঐ ব্যক্তি বাড়ী নেই কিংবা সে চায় না, তুমি প্রবেশ কর। অতএব ফিরে যাও।'' নবী করীম (দঃ) সর্বদাই এই নীতি পালন করতেন এবং এ বিষয়ে অনেক ঘটনারই উল্লেখ আছে। যেমন, যখন তিনি মেয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করতে চাইতেন তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে সালাম পেশ করতেন। বখত তিনি (বিবি ফাতেমা) সাড়া দিতেন, নবী করীম (দঃ) প্রবেশ করতেন। আর যদি তিনবার সালাম পেশ করার পরও কোন সাড়া না পেতেন, তবে তিনি ফিরে আসতেন।

আরবীতে দার ও বাইতের পার্থক্য এখানে উল্লেখযোগ্য। 'দার' হল আঙ্গিনা আর 'বাইত' হল ঘর। পবিত্র কোরানে বাইতকে ঘর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আঙ্গিনার দরজাগুলো খোলা থাকে, তাই আঙ্গিনাকে অন্তপুর হিসেবে ধরা হয় না। যদি কোন রমণী এমন পোশাক পরিধান করে যে পোষাকে কোন পুরুষ তাকে দেখা উচিৎ নয়, তাহলে সে পোষাক পরে মহিলার জন্যে আঙ্গিণায় আসা উচিত নয়। সে তখন ঘরে থাকা উচিত। অবশ্য আঙ্গিনাকেও ঘর হিসেবে বিবেচনা করা যায় যদি এর দরজা বন্ধ থাকে এবং উচু দেয়াল দেয়া থাকে। বর্তমানে 'দ্বার' ও 'বাইত' উভয়ের জন্যে একই নিয়ম প্রযোজ্য। 'বাইত' বলতে মূলতঃ ঘরোয়া স্থানকে বুঝায়, কোন মহিলা চান না সেখানে কোন পরপুরুষ তাকে দেখুক। ''এটা তোমাদের জন্যে অধিকতর পবিত্র।" অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই তা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক, এর ফলাফল ভাল এবং তা অযৌক্তিক নয়।'' জেনে রাখো, এটাই উত্তম।"

"তোমরা যদি সেখানে কাউকে না পাও, তবে সে পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করো না যে পর্যন্ত না যাওয়ার অনুমতি পাও। তোমাদের যদি বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে ফিরে

যাবে। উহাই তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।'' (২৪ঃ২৮)'[৩]

" যে গৃহে কেহ বাস করে না সেখানে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী থাকলে সেখানে প্রবেশে তোমাদের কোন পাপ নেই। খোদা অবগত আছেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর। "(২৪ঃ২৯)

আরবদের জন্য এটা দুর্বোধ্য ছিল। প্রথম কষ্টকর কাজ ছিল ভিতরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা, তার চেয়েও কষ্টকর ছিল ফিরে আসা যখন তাদরে ফিরে আসতে বলা হতো। ঘর হচ্ছে ব্যক্তিগত স্থান, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন যাপনের স্থান। কোন ঘর এ রকম না হলে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যেমন কোন সরাইখানা অথবা ব্যবসার স্থান। সেখানে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে অনুমতি নিতে হবে না। অথবা জনগণের জন্যে নির্মিত গোসলখানার কথা ধরুন। সেখানেও অনুমতির প্রয়োজন নেই। 'তোমাদের কোন দোষ নেই' যদি সে জায়গা বাসস্থান না হয় এবং যদি তা ব্যবসা কেন্দ্র হয়। ''আল্লাহ সে কথাও জানেন যা তোমরা বল এবং সে কথাও জানেন যা তোমরা গোপন কর।''

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ কেন নিষিদ্ধ তা 'যে গৃহে কেহ বসবাস করে না, কথাটি দ্বারা অনুধাবন করা যায়। প্রথমতঃ ঘরে একজন লোকের স্ত্রী থাকতে পারে। অধিকন্তু ঘর হচ্ছে এক ব্যক্তির নিজস্ব ভুবন। সেখানে হয়ত এমন অবস্থা বা পরিবেশ আছে যে সে চায়না তা অপর কেউ দেখুক।

সুতরাং কোন লোক যদি অপরের নিজস্ব ঘরে প্রবেশ করতে চায় তবে তার জন্য তাকে তার উপস্থিতির পূর্ব ঘোষণা দেওয়া আবশ্যক। কোন লোক অবশ্যই অন্য লোকের নিজস্ব ঘরে প্রবেশের পূর্বে যে কোন উপায়ে তার মনোযোগ আকর্ষণ করবে, এমনকি যদিও সে জানে অন্য লোকটি তার প্রবেশের ব্যাপারে জ্ঞাত। সে আপনার বন্ধু। সে জানে আপনি প্রবেশ করছেন। আপনি জানেন, সে আপনার প্রবেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। তারপরও আপনাকে অনুধাবন করতে হবে যে, আপনি তার ঘরোয়া পরিবেশে প্রবেশ করছেন।

দৃষ্টি অবনমিত রাখার নির্দেশ

"বিশ্বাসীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; এটাই তাদের জন্য কল্যাণকর। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।" (২৪ঃ৩০)[৪]

"বিশ্বাসী রমণীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এবং তারা যেন তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে শুধুমাত্র সে স্থান ছাড়া যা সাধারণত খোলা থাকে। তাদের বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে; তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নি, পুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীনে দাসী, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচালনা না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (২৪ঃ৩১)[৫]

"বিশ্বাসীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে"-আয়াতের এই অংশটিতে ব্যবহৃত দুটো আরবী শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া আবশ্যক মনে করি। একটি হলো, 'গাদ' এবং অপরটি হলো, 'আবছার।' অবছার হলো আরবী বাছার শব্দটির বহুবচন। বাছার শব্দটি দ্বারা চোখ আর 'আবছার' শব্দটি দ্বারা দৃষ্টিকে বুঝানো হয়ে থাকে। যদি বলা হয়,'গাদা আইন' তবে এ দ্বারা চোখ বন্ধ করাকে বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে এর একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। 'গা'দ বাছার' দ্বারা কি বুঝানো হয়? 'গা'দ দ্বারা 'অবনমিত করা', 'দৃষ্টি সংযত করা,' ইত্যাদিকে বুঝানো হয়, ঢাকা বা বন্ধ করা বুঝায় না। অন্য একটি আয়াতেও আমরা এটা দেখতে পাই, "চলনে বিনয়ী হও এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। অতি নীচু কণ্ঠস্বর হলো গাধার।" (৩১ঃ১৯) [৬] এখানে নীরব থাকার কথা বলা হয়নি। একজন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হবে মধ্যম, না উচুঁ, না নীচু। একইভাবে 'একজনের দৃষ্টি অবনমিত করা' দ্বারা তাকে একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করা কে বুঝানো হয়।

হিন্দ ইবন আবি হা'লাহ্‌র বিখ্যাত হাদীসে নবী (সঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, "যখন তিনি (মহানবী দঃ) খুশী হতেন, তখন তিনি চোখ দুটো নিম্নমুখী করতেন।"[৭] এ দ্বারা বুঝানো হয় না যে, তিনি চোখ একেবারে বন্ধ করতেন।

মা'জলিশি নবী (দঃ) এর এই বিষয়টিকে বিহারে এভাবে বর্ণনা করেন, ''তিনি তার দৃষ্টিকে আড়াল করতেন এবং মস্তক অবনত করতেন। তিনি তা করতেন তাঁর খুশী ভাবকে প্রদর্শন না করার জন্য।''

না'হ্জুল বালাগায় হযরত আলী বলেছেন তিনি তাঁর পুত্র ইমাম হাসানকে জামালের যুদ্ধের পতাকা দিয়ে বলেন, ''এমনকি যদি পর্বতসমূহও স্থানচ্যুত হয়, তবুও তোমার স্থান পরিত্যাগ করো না। দাঁতে দাঁত কষে ধর (যাতে তোমার ক্রোধ বৃদ্ধি পায়), আল্লাহর সামনে তোমার মস্তক উন্মোচিত কর এবং মাটিকে তোমার নখ দ্বারা আঁকড়ে ধর। শত্রুর শক্তি নিরীক্ষা কর এবং দৃষ্টি অবনত রাখ[৮] অর্থাৎ, শত্রুর প্রতি দৃষ্টি নিষ্পলক নিবদ্ধ রেখ না।" কারো দিকে তাকানোর দুটো পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি হল, কাউকে দেখতে কেমন দেখায় বা তার কাপড়চোপড় কেমন তা দেখার জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাকে নিরীক্ষণ করা। অপর প্রকার তাকানো হচ্ছে কারো সাথে কথা বলার জন্যে তাকানো এবং কথা বলার প্রয়োজনে যতটুকু তাকানো দরকার ততটুকুই তাকানো। এ ধরনের তাকানোকে সম্বোধনের দৃষ্টি বলা যায় এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কথা বলা। এ প্রকারের তাকানোকে আমরা স্বাভাবিক তাকানো বলতে পারি। কিন্তু প্রথম প্রকারের তাকানো হচ্ছে ইচ্ছাকৃত তাকানো। সুতরাং আলোচ্য বাক্যের তাৎপর্য হল, ''বিশ্বাসীদের বলে দাও', তারা যেন মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখে অথবা মেয়েদের মন পাওয়ার জন্যে তাদের সাথে হাসি ঠাট্টায় লিপ্ত না হয়।

গোপন অঙ্গসমূহ হেফাজত করা

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে "বিশ্বাসী পুরুষদের বলুন–"তারা যেন লজ্জাস্থানের হেফাজতকরে।" (২৪ঃ৩০)

এখানে কি থেকে হেফাজত রাখার কথা বলা হয়েছে? এখানে ঐসব বস্তু থেকে হেফাজত রাখার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো অন্যায়। আরো বলা হয়েছে, দূনীতি এবং অপরের কুদৃষ্টি থেকে হেফাজতে রাখার কথা।

আপনারা জানেন, অজ্ঞতার যুগে আরবদের মধ্যে তাদের গোপনাঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার কোন প্রথা চালু ছিল না। কিন্তু ইসলাম আসার পর গোপনাঙ্গসমূহ আবৃত করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাক–ইসলামিক যুগের বর্বর আরবদের রীতি নীতিগুলোকে অনুসরণ করা শুরু করেছে। তারা নগ্নতার সমর্থনে জোর গলায় দর্শনও প্রচার করছে। দার্শনিক রাসেল তার 'On Discipline' বইটিতে বলেছেন, এটা আর একটি অযৌক্তিক নীতি বা প্রথা যে পিতা–মাতারা তাদের সন্তানদের কাপড় পরিধান করার কথা বলে, যা সন্তানদের মধ্যে বড় রকমের কৌতূহল সৃষ্টি করে। তার মতে, পিতা–মাতাদের উচিত তাদের গোপনাঙ্গসমূহ সন্তানদের দেখানো যাতে করে তারা শুরু থেকেই সতর্ক ও সচেতন হতে পারে।

কিন্তু পবিত্র কোরআন বলে "এবং তোমাদের গোপনাঙ্গসমূহ হেফাজত কর," অন্যায় হতে এবং অপরের লোলুপ দৃষ্টি থেকে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার গোপনাঙ্গগুলো হেফাজত করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এটা প্রযোজ্য নয়। পুত্রের সম্মুখে মাতার এবং কন্যার সম্মুখে পিতার নগ্নতাকে ইসলাম অনুমোদনকরেনি।

"উহাই তাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত আছেন।(২৪ঃ৩০)।[৯]

নবী করীম (দঃ) বলেছেন, শৈশবকাল থেকেই একটা ঘটনা বারংবার ঘটেছে। তিনি বুঝতে পারেন যে তার মধ্যে এক ধরনের শক্তি কাজ করে, যা তাকে ঐসব কার্যাবলী থেকে দূরে রাখতো, যা প্রাক–ইসলামিক বর্বরযুগের আরবরা করতো। তিনি বলেছেন, একদিন শিশুকালে তিনি অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলছিলেন। নিকটে মিস্ত্রীরা

এক কোরাইশের বাড়ী নির্মাণ করছিলো। শিশুরা তাদের ইট, পাথর ইত্যাদি বহনে সাহায্য করে আনন্দ উপভোগ করছিল। শিশুরা তাদের লম্বা কোর্তায় করে ওগুলো বহন করছিল। ঐসব কোর্তার নীচে তারা আর কিছুই পরিধান করেনি। ফলশ্রুতিতে তাদের গোপনাঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছিল। মহানবীও অন্যান্যদের মত কোর্তায় ইট ও পাথর রাখলেন এবং যখন দাঁড়াতে গেলেন, অনুভব করলেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। তিনি বারংবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে এটা তার করা উচিত হবে না।[১০]

''বিশ্বাসী রমণীদের বলুন তারা যেন দৃষ্টি অবনমিত রাখে---"(২৪ঃ৩১)। আপনারা লক্ষ্য করুন, কোরআনের এই দুটো আয়াতেই পুরুষ ও রমণীদের জন্য অভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পুরুষদের জন্য বিশেষ করে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যদি কেবল নারীদের জন্য পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপকে নিষেধ করা হতো এবং পুরুষদের জন্য নিষেধ না করা হতো তাহলে পুরুষদের জন্য যা যা জায়েজ এবং মহিলাদের জন্য যা যা না-জায়েজ তা অবশ্যই উল্লেখ করা হতো। সুতরাং এটা পরিষ্কার, এখানে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এর অন্য উদ্দেশ্য আছে যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের টীকা

১· কোরআন, ২৪ঃ ২৭

২·, কোরআন, ৩৩ঃ৫৪

৩·কোরআন,২৪ঃ২৭ঃ২৮

৪· কোরআন, ২৪ঃ৩০

৫· কোরআন, ২৪ঃ ৩১

৬· কোরআন, ৩১ঃ ১৯

৭· তাফসীর-আল-কোরআন, সাফী ২৪ঃ৩১ আলী ইব্নে ইব্রাহিমী কোমি থেকে বর্ণিত

৮· নাহজুল বালাগাহ উপদেশ-১১০

৯· নাহজুল বালাগাহ উপদেশ - ২২৭

১০· ইবনে আবিল হাদিদ, শরহে আল নাহজুল বালাগাহ উপদেশ ১৯০

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী হিজাব– দ্বিতীয় অংশ
সাজসজ্জা প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা

'এবং তাদের গোপনাঙ্গসমূহ হেফাজত করা।' আরবীতে নারী, পুরুষ উভয়ের গোপনাঙ্গ বুঝাতে 'ফারয' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ নারী–পুরুষ উভয়কে যে তাদের পবিত্রতা ও গোপনাঙ্গসমূহ হেফাজত ও সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে তা দুটি বিষয়ের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। একটি হলো অপরের দৃষ্টি থেকে গোপনাঙ্গসমূহ হেফাজতের প্রেক্ষিতে, অবশ্য স্বামী–স্ত্রীর বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। অপরটি হলো যে কোন ধরনের অন্যায় ও যৌনতাড়না থেকে পবিত্রতাকে হেফাজতের প্রেক্ষিতে। যদি আমরা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থকে প্রাধান্য দিই তাহলে আমরা বলবো উহা অন্যায়–অনাচার থেকে পবিত্রতাকে হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। মহানবীর (দঃ) সাহাবাদের যুগ থেকে এবং পবিত্র কোরআনের প্রারম্ভিক আয়াতগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে কোরআনের যেখানেই বলা হয়েছে ''তাদের গোপনাঙ্গসমূহ হেফাজত কর'', তা দ্বারা ব্যভিচার বুঝানো হয়েছে। তবে যে সব আয়াতে গোপনাঙ্গসমূহ অপরের দৃষ্টি থেকে হেফাজতের কথা বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন কথা। হাদীসসমূহ থেকে আমরা দেখতে পাই, এই আয়াতটিতে সামষ্টিক দৃষ্টি কিংবা অপরের দৃষ্টিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কারো কোন দ্বিমত নেই।

তৃতীয় কর্তব্য হলো, "তারা যেন তাদের সাজসজ্জা ---প্রদর্শন না করে।" সাজসজ্জা বলতে এখানে সে সব আকর্ষণীয় জিনিস তাদের শরীর থেকে পৃথক, যেমন, অলঙ্কারাদি ও স্বর্ণ এবং সে সাথে তাদের শরীরের সাথে সংযুক্ত দর্শনীয় সৌন্দর্যসমূহ, যেমন, মেহদী, কাজল ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

ব্যতিক্রম সমূহ

''তারা তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করবে না'–এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে দুটো ব্যতিক্রম ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে একটি হলো ''বহির্ভাগ ছাড়া----'' অন্যটি

হলো "তাদের স্বামীদের ক্ষেত্রে ছাড়া---"। উভয় ব্যতিক্রম নিয়েই পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে, বিশেষ করে প্রথম ব্যতিক্রম নিয়ে।

নারীদের "তাদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করা উচিত নয়---কেবল বহির্ভাগ ছাড়া।" এটা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এটা দ্বারা কি সার্বক্ষণিক আবৃত সৌন্দর্যসমূহকে বুঝানো হয়? এখানে "বহির্ভাগ দ্বারা আসলে কি নির্দেশ করা হয়েছে? ইসলামের প্রারম্ভিককাল থেকেই এই "বহির্ভাগ ছাড়া ----" সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই প্রশ্নগুলো রাসূলের সাহাবী কিংবা সহচরদের কাছ থেকেই উত্থাপিত হয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক শিয়া মুসলমানও মাসুম ইমামদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন। এ বিষয়ে তারা সকলেই প্রায় ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। সে যাই হোক, হোন শিয়া যারা ঐসব হাদীসের প্রেক্ষিতে মতামত ব্যক্ত করেন কিংবা হোন সুন্নী যারা রাসূলের সাহাবী ও সহচরদের উদ্ধৃতির প্রেক্ষিতে মতামত ব্যক্ত করেন, তারা উভয়েই এ বিষয়ে কম-বেশী একমত যে "বহির্ভাগ দ্বারা' কাজল, আংটি, কাঁকন ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ ঐসব সাজসজ্জা যা দু'হাতে এবং মুখে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এটা হতে বুঝা যায় যে, মহিলাদের জন্য তাদের দুহাত এবং মুখাবয়ব আবৃত করা বাধ্যতামূলক নয়। মুখ ও হাতে ব্যবহৃত সাজসজ্জা অনাবৃত রাখা জায়েজ আছে।

এই সম্পর্কে অনেক বিখ্যাত হাদীস আছে। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলো "কোন্ কোন্ সাজসজ্জা প্রদর্শনযোগ্য; তথা কোন্ কোন্ সাজসজ্জা আবৃত করার কোন আবশ্যকতা নেই।" তিনি উত্তরে বললেন, "এটা কাজল ও আঙ্গুলের আংটি এবং এগুলো মুখের ও হাতের।" আবি বছির বলেন, তিনি ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) কে এটার ব্যতিক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জাফর সাদেক (আঃ) উত্তরে বলেন, "আংটি এবং কাঁকন।"[৩] এ বিষয়ে একটি হাদীস প্রচলিত আছে। এ হাদীসটির বর্ণণাকারী শিয়া না হলেও তার বিশ্বস্ততার কারণে আলেমগণ হাদীসটি উল্লেখ ও বর্ণণা করে থাকেন। হাদীসটি হলো ইমাম জাফর ইব্ন মুহাম্মদ (আঃ) হতে উদ্ধৃত। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন, "ব্যতিক্রম হলো মুখাবয়ব ও হস্তদ্বয়।" সবাই আসলে একই কথা বলেছেন। যেখানে তাদের হাত ও মুখ আবৃত রাখারই আবশ্যকতা নেই, সেখানে এসব অঙ্গে ব্যবহৃত সজ্জার ক্ষেত্রেতো কোন কথাই ওঠে না।

আলী ইব্ন ইব্রাহীম হতে বর্ণিত আছে ইমাম বাকের (আঃ) কে এই ব্যতিক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এটা হলো মহিলাদের পোশাক, কাজল, আংটি, হাতের তালু রাঙানো এবং কাঁকন।" অতঃপর ইমাম আরো বলেন, সাজসজ্জার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ের সাজসজ্জা সকল ধরনের লোক দেখতে

পারে, দ্বিতীয় পর্যায়ের সাজসজ্জা কেবল তারা দেখতে পারে যাদের সাথে বিয়ে হারাম। আর তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের সাজসজ্জা দেখতে পারে শুধু স্বামী। কাজেই সাধারণ সকলকে দেখানো যেতে পারে এমন অঙ্গাদি ও সাজসজ্জাদি হচ্ছে মুখাবয়ব ও দু'হাত এবং উহাতে পরিহিত সজ্জাদি, যেমন, কাজল, আংটি, কাঁকন ইত্যাদি। আর যাদের সাথে বিবাহ হারাম তাদের গ্রীবাদেশ পর্যন্ত দেখানো যেতে পারে। তদুপরি পূর্বোল্লেখিত সাজসজ্জাদি ছাড়াও, গলার হার, বাহুবন্ধ, ঝুমুর এবং পায়ের গিঁটের নীচে পরিহিত যাবতীয় সাজসজ্জাদি দেখানোরও অনুমতি আছে। মাহ্‌রামদের সম্মুখে কি কি সাজসজ্জা প্রদর্শন করা যেতে পারে তা নিয়ে দ্বিমত আছে। তবে যাবতীয় হাদীস ও ফকিহদের মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, মহিলাদের নাভী থেকে হাঁটুদেশ পর্যন্ত স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর অনুমোদন নেই। সুতরাং একজন মহিলা তার স্বামী ছাড়া আর সকলের সম্মুখে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখবে, এমনকি তার পিতা ও ভাইদের সামনেও। নাভী থেকে নিয়ে শরীরের উপরাংশও পিতা ছাড়া সকলের সামনে ঢেকে রাখতে হবে। শুধুমাত্র স্বামীকেই একজন মহিলা তার পুরো শরীর দেখাতে পারে।

এই বিষয়ে অন্যান্য যে সব হাদীস এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত পাওয়া যায় তা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মহিলারা অবশ্যই তাদের বক্ষদেশ আবৃত রাখবে। এই আয়াতটি নাজিলের আগে মহিলারা স্কার্ফ পরিধান করতো। কিন্তু তারা স্কার্ফের প্রান্তদেশ মাথার পেছনে নিয়ে যেত এবং যেহেতু 'ভি-গলা'এর পোশাক পরিধান করতো ফলে তাদের গ্রীবার পেছনভাগ, কান এবং বক্ষদেশ দেখা যেত। কিন্তু এই আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর থেকে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, তারা তাদের মাথার অবগুণ্ঠন দিয়ে গ্রীবা, কান ও বক্ষদেশ আবৃত করবেন। ইবনে আব্বাস, যিনি একজন প্রসিদ্ধ হাদীসবর্ণনাকারী, বর্ণিত হাদীস অনুসারে "মহিলাদের জন্য তাদের বক্ষদেশ ও গ্রীবাদেশ আবৃত করা বাধ্যতামূলক।'[৫]

প্রথমে যে সব ব্যতিক্রম ক্ষেত্রের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেখানে সেসব অঙ্গ ও সাজসজ্জার কথা বলা হয়েছে যেগুলো ঢেকে রাখা অত্যাবশ্যক নয়। ব্যতিক্রম সংক্রান্ত দ্বিতীয় আলোচনায় এসেছে তাদের কথা যাদের সামনে অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন নেই, যেমন, স্বামী, শিশু, পিতা প্রভৃতি।

মেয়েদের দিকে পুরুষের তাকানো কি যায়েজ

এক্ষেত্রে দুটো দিক আছে যেগুলো অন্ততঃ মানসিকভাবে চিহ্নিত ও পরস্পর থেকে পৃথক করা আবশ্যক। তন্মধ্যে একটি হলো মহিলাদের জন্য কোন্ কোন্ জিনিস আবৃত করা অবশ্যই কর্তব্য এবং কোন্ কোনটি অবশ্য কর্তব্য নয়। আমরা যদি বলি, মহিলাদের জন্য তাদের দু'হাত ও মুখাবয়ব আবৃত করা বাধ্যতামূলক নয় এবং যদি আরো বলি যে, পুরুষদের দৃষ্টি অবনমিত রাখাই উত্তম করণীয় তবে কি উক্ত কথা দুটোর মধ্যে কোন অসংগতি থাকে? অথবা এটা কি ভিন্ন কিছু? এটা কি পৃথকভাবে আলোচনা করার মত কিছু? এটা কি সম্ভব যে মহিলাদের জন্যে অবগুণ্ঠন করা অত্যাবশ্যকীয় হবে না, যদিও ইসলামী আইনে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, অথচ পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনমিত রাখতে বলা হবে?

আমরা রসূলে খোদার জীবনধারা থেকে জানি যে, পুরুষদের জন্য তাদের মাথা, মুখাবয়ব, গ্রীবা, হাত এগুলো আবৃত করা বাধ্যতামূলক নয়। এর অর্থ কি পুরুষ যখন পথ চলবে তখন তার সম্মুখ দিয়ে কোন মহিলা যাতায়াত করলে পুরুষের জন্যে তার দৃষ্টি অবনত রাখা জরুরী নয়? এ দুটো হচ্ছে দুটো স্বতন্ত্র বিষয় এবং পরে তা পৃথকভাবে আলোচনা করতে হবে।

অন্য বিষয়টি হলো– উপরোল্লেখিত হাদীস ও কোরআন অনুযায়ী ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া নারীদের অপরাপর সকল অঙ্গাদি ও সজ্জাদি আবৃত করা বাধ্যতামূলক। এই বাধ্যবাধকতারও অবশ্য ব্যতিক্রম আছে যা পরবর্তী আয়াতে আলোচনা করা হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌছানোর পর তাদের আর এরূপ বাধ্যবাধকতা মানতে হয় না। কিন্তু সাধারণভাবে ইসলামী বিধিমতে মহিলাদের চুল আবৃত করা বাধ্যতামূলক। এটা সুস্পষ্ট যে, যদি এতখানি চুল আবৃত থাকে যা থেকে লোকেরা কোন মহিলার মাথা অনাবৃত বলে ধারণা করে তবে তা ইসলামে নিষিদ্ধ। মহিলাদের গ্রীবা, বক্ষদেশ, কব্জি থেকে বাহু পর্যন্ত অংশ, পায়ের গিঁট (এ ব্যাপারে মতভেদ আছে) থেকে তার উপরিভাগ–এসব আবৃত রাখা ইসলামী বিধিমতে বাধ্যতামূলক। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

আর একটি আলোচ্য বিষয় যা আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করবো বলেছিলাম তা হলো দৃষ্টি অবনমিত রাখা যুক্তিযুক্ত কি–না। দৃষ্টিতে যদি কামনা থাকে, দৃষ্টিতে যদি যৌন আনন্দ লাভের প্রত্যাশা থাকে তবে তা ইসলামী বিধিমতে নিষেধ। এটা কেবল অচেনা লোক ও গায়ের মাহ্‌রাম লোকদের জন্যই যে প্রযোজ্য তা নয় এটা মাহ্‌রাম

লোকদের বেলাতেও প্রযোজ্য। যদি পিতা তার সোমত্ত কন্যার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায় তবে তা নিষিদ্ধ তো বটেই বরং উহা মহাপাপ। শ্বশুরের জন্য তার পুত্রবধূর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানোও ইসলামী আইনমতে নিষিদ্ধ। একজন পুরুষের অপর একজন পুরুষের প্রতিও কামভাব নিয়ে তাকানো নিষিদ্ধ। সুতরাং ইসলামে বিবাহিত যুগলের ক্ষেত্রে কেবল কামদৃষ্টিকে অনুমোদন করেছে, আর অন্য যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তির জন্য তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

তবে এটা অবশ্যই 'রিবা' থেকে আলাদা। রিবার অর্থ হচ্ছে তাকানো, লোলুপ দৃষ্টিতে দেখা নয় বা প্রকৃতপক্ষে অন্য ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করাও নয়। কিন্তু এখানে তাকানো বলতে একটি বিশেষ অবস্থায় দর্শন বুঝানো হচ্ছে যা বিপজ্জনক হতে পারে। আশঙ্কা থেকেই যায় যে দর্শন বা দেখা এক ব্যক্তিকে এক নিষিদ্ধ অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে। সুতরাং এটাও নিষিদ্ধ এবং এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।

অতএব যদি কেউ বলে দেখা জায়েজ তাহলে একথা দিয়ে লোলুপতাপূর্ণ দৃষ্টি বোঝায় না অথবা এমন কোন দৃষ্টির কথা বোঝায় না যা কাউকে নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ধাবিতকরে।

এখন আমরা দেখার বিষয়টি আলোচনা করবো। ইমাম আলী রেজার (আঃ) ভ্রাতা আলী ইবনে জাফর কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, একজন পুরুষ সে মহিলাকে কতটুকু দেখতে পারে যে তার কাছে হারাম নয়? তিনি বললেন, "তার মুখমন্ডল, তার হাত ও পায়ের পাতা।[৬] অবশ্যই মুখমন্ডল এবং হাত, তবে ফকীহ্‌গণ পায়ের পাতা সম্পর্কে ফতোয়া দেননি।

আরেকটি হাদীস আছে। সে হাদীসটি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে সফরে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তার যানাজার গোসল দেয়ার জন্যে কোন পুরুষ বা মাহরাম মহিলা সেখানে নেই। এমতাবস্থায় তার জানাযার গোসল দেয়ার জন্য কি করা উচিত? বিপরীতটাও জিজ্ঞেস করা হলো, একজন মহিলা সফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে এবং সেখানে মাহ্‌রাম পুরুষরাও নেই যারা তার জানাযার গোসল দিতে পারে। এ'দটো ক্ষেত্রেই ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি (ইমাম জাফর সাদেক) বলেন, "প্রথম ক্ষেত্রে সেখানে উপস্থিত মহিলারা (মৃত) পুরুষ ব্যক্তিটির দেহের ঐ অংশটি স্পর্শ করতে ও ধূতে পারবে যা দেখা তার জীবদ্দশায় তাদের জন্য জায়েয ছিল। মৃতা মহিলা সম্পর্কেও ঠিক একই রকম কথা বলা হয়। গায়র মাহ্‌রাম পুরুষরা কেবলমাত্র তার (মৃতা মহিলার) দেহের ঐ অংশ ধূতে পারবে যে অংশ তারা তার জীবদ্দশায় দেখতে পারতো। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন

যে, যদি তারা তার (মৃতা মহিলার) মুখমন্ডল স্পর্শ করে এবং তার মুখমন্ডল ও হাতগুলো ধুয়ে দেয় তাহলে তাই যথেষ্ট হবে। ঠিক ঐ মুহূর্তে তার পুরো দেহটা ধোয়া জরুরী নয়। সুতরাং বুঝা গেল একজন পুরুষ একজন জীবিত মহিলার মুখমন্ডল ও হাতের দিকে তাকাতে পারে।

আমরা এ বিষয়টি মুস্তামসাকে বর্ণিত হাদিসটিতেও দেখতে পাই যা আয়াতুল্লাহ হাকিম হযরত ফাতেমা (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সাহাবী হযরত সালমান ফারসী সম্পর্কে একটি হাদীস আছে, যিনি একদা হযরত ফাতেমা (আঃ) এর গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, তিনি যব গুঁড়ো করছেন এবং তার হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে। এই হাদীসটি পরিষ্কার করে দেয় যে, হাতগুলো ঢাকা ছিল না এবং তাঁর হাতের দিকে তাকানোও নিষিদ্ধ ছিল না। কারণ যদি তাই হতো অর্থাৎ হাতের দিকে তাকানো যদি নিষিদ্ধই হতো তাহলে সাহাবী হযরত সালমান ফারসী তাঁর হাতের দিকে তাকাতেন না, আর হযরত ফাতেমা জহুরাও তাঁর হাতগুলো উন্মুক্ত রাখতেন না।

এ হাদীসটি থেকে আরো সহীহ হযরত জাবিরের একটি হাদীস রয়েছে যা আল-কাফী, আল-ওয়াসাইল এবং হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে দেখা যায় এবং যা উলামা ই কিরাম বর্ণণা করে থাকেন। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম (দঃ) এর সাথে হযরত ফাতেমার গৃহে গেলেন। নবী করীম (দঃ) বলেছিলেন যে, অন্যের গৃহে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই অনুমতি চাইতে হবে যদি সেই গৃহ কারো নিজ মায়েরও হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে , নিজ স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করার সময় কারো অনুমতি গ্রহণ করতে হবে না। যখন মহানবী (দঃ) হযরত ফাতেমার (আঃ) বাড়ীতে পৌঁছলেন তখন তিনি প্রবেশ না করে জোরে জোরে বললেন, ''আস-সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত।'' হযরত ফাতেমা ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দিলেন। নবী করীম (দঃ) বললেন, ''তুমি কি আমাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে? ফাতেমা বললেন, ''হ্যাঁ!, আপনি প্রবেশ করুন।'' তিনি বললেন, ''আমার সাথে যে ব্যক্তিটি আছে সেও কি প্রবেশ করতে পারে?'' হযরত ফাতেমা বললেন, ''না। আমি আমার মাথা ঢাকা পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন।'' অতঃপর তিনি বললেন, ''প্রবেশ করুন।'' পুনরায় নবী করীম (দঃ) বললেন, ''আমার সাথে যে লোকটি আছে সেও কি প্রবেশ করতে পারবে?'' তখন হযরত ফাতেমা বললেন, ''জ্বী হ্যাঁ।'' জাবির বলেন, যখন তিনি প্রবেশ করলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, হযরত ফাতেমার মুখমন্ডল পান্ডু বর্ণ। ''আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম যখন আমি বুঝতে পারলাম যে খাদ্যাভাবের কারণেই তার চেহারা এরকম হয়ে গেছে। আমি নিজকে বললাম, 'দেখ

একজন খলিফা বা রাজার কন্যা কিভাবে প্রতিপালিত হয় আর আল্লাহর নবীর কন্যা প্রতিপালিত হন কিভাবে।" ৮

এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ফাতেমা স্বীয় মুখমন্ডল বা হাত ঢাকেননি। তা না হলে জাবির (রাঃ) তা দেখতে পেতেন না।

বহু রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন, "কোন ব্যক্তিই একজন মহিলার বাহু বা মহিলার চুলের দিকে তাকাতে পারবে না।" এসব কিছুই উল্লেখিত আছে তবে কোথাও মুখমন্ডল ও হাত সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে ইহ্‌রাম বা হাজীদের পোশাক। সেখানে মহিলাদেরকে তাদের মুখমন্ডল ঢাকতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, এটা (মুখমন্ডল ঢাকা) ওয়াজিব নহে। এমনটি হতে পারে না যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা ইসলামী মতে ওয়াজিব এবং ইহরামে ওয়াজিব নয়, বরং সেখানে তা নিষিদ্ধ।

"তারা যেন তাদের বক্ষদেশের উপর তাদের চাদর টেনে দেয়।" এই আয়াতটি নিজেই বিষয়টির সীমা-পরিসীমা ব্যক্ত করে এবং এতে মুখাবয়ব ও হাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যারা বলে, তাকানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, তারা এমন এক জিনিসকে যুক্তি হিসেবে দেয় যা তাকানো নিষিদ্ধ না হওয়ার ক্ষেত্রেই পেশ করা হয়েছে। তারা যুক্তি হিসেবে "মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে"-এ আয়াতটি উদ্ধৃত করে। এর উত্তর হল, প্রথমত আয়াতটি কিসের দিকে তাকাতে হবে না তা বলে দেয়নি। দ্বিতীয়তঃ আয়াতটি "মিন" উল্লেখ করেছে যার অর্থ হচ্ছে "কোন কিছু হতে" এবং তৃতীয়তঃ 'গাদ্' অর্থ হচ্ছে 'নত বা নীচু রাখ বা অবনত কর।'

আরেকটি হাদীস আছে যা উদ্ধৃত করা হয় এবং যারা বলে যে তাকানো নিষিদ্ধ তাদের হাদীসটি দেখা উচিত। এক ব্যক্তি ইমাম হাসান-আল-আস্‌কারীর নিকট একটি চিঠি দেয়। সেখানে সে লিখে, একজন মহিলা কোন বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিতে চায় এবং অন্যেরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকার জন্যে তার স্বীকারোক্তি শুনতে চায়। তাকে কি অবশ্যই পর্দার অন্তরালে থেকে স্বীকারোক্তি দিতে হবে এবং অন্যেরা কি পর্দার অন্তরাল থেকে তা শুনবে যাতে তারা পরবর্তীতে বলতে পারে যে এটাই ছিল তার কণ্ঠ? ইমাম বললেন, "না। তাকে (উক্ত মহিলাকে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্য অবশ্যই সামনে

আসতে হবে, তবে তাকে অবগুণ্ঠিত অবস্থায় এমন ভাবে আসতে হবে যাতে কেবল তার মুখাবয়বের গোলাকৃতিটি দেখা যায়।

অন্য আরেকটি হাদীস যা প্রায়ই তারা উপস্থাপন করে থাকেন, একটি বহুল প্রচলিত হাদীস। সাদ ইসকাফ এক ব্যাক্তি সম্পর্কে বলেন, সে নবী করীম (দঃ) এর নিকট রক্তঝরা মুখমন্ডল নিয়ে গিয়ে বললো যে, তার একটা অভিযোগ রয়েছে। নবী করীম (দঃ) তাকে বলতে বললেন। সে বললো, ''সে মদীনার রাস্তায় হাঁটছিল এবং তার দিকে একটি মহিলা আসছিল যে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী, মাথায় স্কার্ফ পরিহিতা এবং তার বক্ষদেশ দেখা যাচ্ছিল। যখন সে তাকে অতিক্রম করে চলে গেলো। সে তার দিকে তাকানোর জন্য মাথা ঘুরালো আর তার নিজের সামনে কি রয়েছে তা দেখেনি। দেয়ালের বাইরে কোন কিছু লাগানো ছিল এবং তা তার মুখে এসে লাগে এবং তাকে আহত করে।" তখনই এই আয়াতটি নাযিল হলো ''মুমিন পুরুষদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখতে বলে দিন।'' কিন্তু এ আয়াতটি দ্বারা কেবল উপরোক্ত ধরনের মহিলাদের কথা বুঝানো হয়েছে, সব মহিলাদের কথা বলা হয়নি। আয়াতে কি কি ঢেকে রাখতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে, এরচেয়ে বেশী ঢাকতে হবে না, কম ঢাকলেও চলবে না।

এ প্রেক্ষিতে আরেকটি যুক্তি তারা দেয় যে, হাদীস সমূহে আছে, সব কিছুরই অবৈধ কাজ আছে। চোখের অবৈধ কাজ হচ্ছে তাকানো।'' উত্তর হচ্ছে এই তাকানোটা লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকানো, কেবল তাকানো নয়। যেমন অন্য হাদীসের মতে, বক্র তাকানোটা হচ্ছে শয়তানের তীর। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই কামনার দৃষ্টিতে তাকানোকে নির্দেশ করা হচ্ছে।

আরেকটি হাদীস আছে যা আমি সুন্নীদের হাদীস গ্রন্থসমূহে পড়েছি। এতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (দঃ) কোন এক সফরে, সম্ভবতঃ বিদায় হজ্জের সফরে, ছিলেন। তিনি ইবনে আব্বাসকে তার পেছনে দাঁড় করান। ইবনে আব্বাস ছিলেন তখন এক তরুণ বালক। যে সব ইহরাম পরিহিতা মহিলারা সামনে পিছে দিয়ে অতিক্রম করছিল তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁর (ইবনে আব্বাসের) মুখমন্ডল ঘুরিয়ে দিলেন। ইবনে আব্বাস তখন সেই দিক থেকেই আবার তাকাতে শুরু করলেন। নবী করীম (দঃ) আবার ইবনে আব্বাসের মুখমন্ডল ঘুরিয়ে দিলেন।

শিয়া সূত্রসমূহ অনুযায়ী উল্লেখিত হাদীসটিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হাদীসটিতে বর্ণিত আছে যে, তিনি অত্যন্ত সুদর্শন তরুণ বালক ছিলেন এবং নবী করীম (দঃ) সম্ভবতঃ একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। কাসামিয়া কবীলার একজন মহিলা

নবী করীম (দঃ) কাছে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আসে। সে নবী করীম (দঃ) কে জিজ্ঞেস করল এবং নবী করীম (দঃ) উত্তর দিলেন। তখন নবী করীম (দঃ) বুঝতে পারলেন যে উক্ত মহিলার চোখের দৃষ্টি ফযল ইব্ন আব্বাসের উপর স্থির হয়ে আছে এবং ফজল ইবনে আব্বাসও মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। হাদীসটিতে বর্ণিত আছে যে, তখন নবী করীম (দঃ) ফযলের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন, ''একজন তরুণী মহিলা ও একজন তরুণ পুরুষ, আমি ভয় পাই যে তাদের মাঝে শয়তান ঢুকে যাবে।'' [৯]

তারা বলেন- এ কারণেই এটা পরিষ্কার যে এভাবে তাকানো নিষিদ্ধ। এতে কোন সন্দেহ নেই এতে প্রণয়ের উদ্রেক হয় এবং এটা নিষিদ্ধ। শায়খ আনসারী বলেন, এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মহিলাদের মুখ ঢাকা বা আচ্ছাদিত করা ওয়াজিব নয় এবং সাধারণভাবে পুরুষদের তাকানোটাও নিষিদ্ধ নয়। তা না হলে নবী করীম (দঃ) তাকাতেন না। কিন্তু তিনি যখন উক্ত মহিলার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তখন তার দিকে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি দেখতে পান, তার (মহিলার) চোখ ফযল ইবনে আব্বাসের উপর স্থির হয়ে আছে এবং ফজলের চোখ মহিলার উপর।

আয়াতুল্লাহ হাকিম আরেকটি হাদীস রেওয়াত করেন। আলী-বিন-সালাহ নামের এক ব্যক্তি ইমাম রেজাকে (আঃ) বললেন, ''আমার একটা সমস্যা আছে। আমি সুন্দরী মহিলাদের দিকে তাকাই এবং এরকম করতে আমার ভাল লাগে। কিন্তু আমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই।'' ইমাম বললেন, ''যেহেতু আল্লাহ পাক তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন, অতএব এতে কোন সমস্যা নেই। আর তোমার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। তবে যে কোন অবৈধ কাজকে ভয় কর।''

চতুর্থ পাঠের টীকা

১''কোরআন'' ২৪ঃ৩০ এবং২৪ঃ৩১।
২''কাফী'' খন্ড-৫, পৃঃ ৫২১ এবং ওয়াসাইল, খন্ড ৩, পৃ, ২৫।
৩ ঐ
৪ তাফসীর-আল-কোরআন, সাফী, ২৪ঃ৩১
৫ মাজমা-আল-বায়ান, কোরআন ২৪ঃ৩১
৬ কুরব্-আল-আসনাদ, পৃঃ ১০৫
৭ ওয়াসাইল ঃ খন্ড ঃ ১৭, পৃঃ ১৩৫
৮। কাফী খন্ড ঃ ৫, পৃঃ ৫২৮ এবং ওয়াসাইল ঃ খন্ড ৩ পৃষ্ঠা-২৮
৯ সহীহ্ বুখারী, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা-৬৩;

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী হিজাব—তৃতীয় অংশ

আমরা বলেছি যে, হিজাবের সাথে দু'টি বিষয় জড়িত। প্রথমতঃ নারীদের জন্য কি বাধ্যতামূলক আর পুরুষদের কি মেনে নেয়া উচিৎ। এ কথা পরিষ্কার যে, নারীদের জন্য যা আবশ্যকীয় তা' হচ্ছে তারা তাদের মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের বাকী অংশ ঢেকে রাখবে। পবিত্র কোরআনে বা হাদীসে এমন কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যাতে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে নারীদের মুখ ও হাত ঢেকে রাখাটা বাধ্যতামূলক।

কিন্তু একইভাবে পুরুষদের জন্য মেয়েদের দিকে তাকানো কি বৈধ? এটা পরিষ্কার এবং নিশ্চিত যে কারো দৃষ্টিতে কামুকতা থাকলে তা' বেআইনী। যদি দৃষ্টিতে কামুকতা না থাকে কিন্তু চারপাশের অবস্থা ও পরিস্থিতি এমন থাকে যাতে করে একজন লোকের পক্ষে ভাল থাকা বা মনের দৃঢ়তা বজায় রাখা কষ্টকর তবে সেক্ষেত্রেও তাকানো নিষিদ্ধ। একজন পুরুষের জন্য এমনভাবে অন্য একজন পুরুষের দিকে তাকানোও নিষিদ্ধ। তখন কেবল দুটি প্রশ্ন থাকছে। প্রথমতঃ নারীদের মুখ ও হাত ঢেকে রাখা কি বাধ্যতামূলক এবং দ্বিতীয়তঃ পুরুষের কামুকতা না থাকলে অথবা পথ ভ্রষ্টতার ভয় না থাকলে কি পুরুষ মেয়েদের দিকে তাকাতে পারবে?

হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে

হাদীসের এবং আয়াতের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একথা কমবেশী নিশ্চিত যে নারীদের মুখ ও হাত ঢেকে রাখা আবশ্যকীয় নয় এবং পুরুষদের জন্যও নিষিদ্ধ নয় কোন নারীর মুখের দিকে তাকানো, যদি না তাতে কামুকতা বা ভ্রষ্টতা থাকে। এ'সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। এখানে এর কিছু কিছু উল্লেখ করবো। ইমাম রেজা (রহঃ)-র উল্লেখিত হাদীসে আমরা পাই তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, "কোন লোকের জন্য কি জায়েজ করা হয়েছে যে, সে তার স্ত্রীর বোনের চুলের দিকে তাকাতে পারবে?" ইমাম জবাবে বলেন, "তা বৈধ নয় যদি সে এমন বয়সের নারী না হয় যার হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে। স্ত্রীর বোন অন্য নারীর মতই যার সাথে তুমি আল্লাহর আইনে সম্পর্কিত নও এবং তুমি তার দিকে এবং চুলের দিকেও তাকাতে পার যদি সে রজঃনিবৃত্ত নারী হয়।" এখানে ইমাম রেজা (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, নারীদের চুলের দিকে

তাকানো জায়েজ কিনা, প্রশ্ন করা হয়নি কামহীন দৃষ্টি বৈধ কিনা? ইমাম রেজার বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে, একজন কিশোর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সাত বছরের একটি বালককে কি অবশ্যই ফরজ নামাজে উৎসাহিত করা যায়? তিনি বলেছেন, এটা বাধ্যতামূলক নয় তবে উৎসাহিত করা ভাল। এও প্রয়োজন নয় যে একজন নারীকে চুল লুকিয়ে রাখতে হবে তার কাছে যার এখনো যৌবনারম্ভ হয়নি।" আমরা পুনশ্চঃ দেখি যে এটা চুল আচ্ছাদন সম্পর্কিত, মুখ আচ্ছাদন সম্পর্কিত নয়।

মালিকানাভুক্তদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়

মালিকানাভুক্ত নারী পুরুষের ব্যাপারে প্রশ্ন হচ্ছে, যদি একজন ক্রীতদাসী পুরুষের জন্যে মাহরাম হয় তাহলে একজন ক্রীতদাস তার মহিলা মালিকের জন্যে মাহরাম কি না। এখানে আমি মাহরাম পরিভাষাকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করছি। কেননা অন্যান্যরা এ অর্থে একে ব্যবহার করেন। কিন্তু সাধারণভাবে যখন মাহরাম বলা হয় তখন এর অর্থ হল তাদের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ। ক্রীতদাস তার মহিলা মালিকের চুলের দিকে তাকাতে পারে, কিন্তু সে শ্বশুর ও পুত্রবধূর মত সাধারণ অর্থে মাহরাম নয়– কেউ কেউ বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দেয়া হয়েছে যে, 'ক্রীতদাস মহিলা মালিকের চুলের দিকে তাকানোর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।' এখানেও চুলের কথা বলা হচ্ছে, মুখের কথা নয়।

একজন খোজা কোন মহিলার ক্রীতদাস হোক অথবা নাই হোক, তার ব্যাপারে রায় হল সে হচ্ছে মেয়েদের মত। সুতরাং যে কোন মহিলার চুলের দিকে সে তাকাতে পারে। এক ব্যক্তি ইমাম রেজাকে (আঃ) প্রশ্ন করে, খোজাদের সামনে অবগুন্ঠিত হয়ে থাকা কি অত্যাবশ্যক? জবাবে ইমাম বলেন, না, অত্যাবশ্যক নয়। ''তারা আমার আব্বার ঘরে প্রবেশ করত এবং মহিলারা তাদের সামনে চুল ঢাকতেন না।''

'আহলে কিতাব' (ইহুদী–খৃষ্টান) মহিলাদের ব্যাপারে (তারা জিম্মি হওয়ার প্রয়োজন নেই) কাফেরদের অনুরূপ রায়ই রয়েছে। (ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে যে সকল অমুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেন এবং জিজিয়া ট্যাক্স প্রদান করেন তাদের সেবাযত্ন ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। ইসলামী পরিভাষায় তাদের জিম্মি বলা হয়।) ইহুদী, খৃষ্টান, জরাথুষ্টীয় অথবা অন্য যে

কোন ধর্মের মহিলাদের চুলের দিকে তাকানো দূষণীয় নয়। মহানবী (সঃ) বলেন, 'জিম্মি মহিলাদের হাত ও চুলের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ নয়।'

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে ব্যতিক্রম সম্পর্কে যখনই আলোচনা বা প্রশ্ন উঠেছে তখন মুখ এবং হাতের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেনি। মহিলাদের হাত ও মুখের দিকে দৃষ্টি দেয়া যদি নিষিদ্ধ হত তাহলে ব্যতিক্রম সংক্রান্ত আলোচনায় তা উল্লেখিত হত।

কতিপয় আলেমের মতে, মহানবী (সঃ) এর সময় জিম্মি নারীদের অবস্থা কেমন ছিল তা আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। তারা তাদের শরীরের কতটুকু অনাবৃত রাখতো? এটা পরিষ্কার যে জিম্মি মহিলারা একটা সীমানা পর্যন্ত তাদের চুল ও মুখ অনাবৃত রাখতো। তাই তাদের দিকে তাকানোও নিষিদ্ধ ছিল না। আমি উল্লেখ করেছি, শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কামনাহীন তাকানোই শুধু অনুমোদনযোগ্য। সে ক্ষেত্র হল বিবাহের জন্যে পাত্রী নির্বাচনের সময় একজন পুরুষ যখন কোন মহিলাকে দেখতে চায় তখন সে মহিলাটির দিকে কামভাব নিয়ে তাকাতে পারে। ৫ এ কথা সুস্পষ্ট যে একজন পুরুষ বিবাহ করবে কি না তা ঠিক করার জন্যে কোন মহিলাকে দেখতে গিয়ে বছরের পর বছর অতিবাহিত করতে পারে না। বিবাহ করার জন্যে সেখানে দেখা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও রয়েছে, যেমন তার শিক্ষা কতটুকু, তার বাড়ি কোথায় ইত্যাদি। অন্যান্য সকল শর্ত পাওয়া গেলে দেখার ব্যাপারটা আসে এবং তখনই এভাবে দেখা যায়। দেখার উদ্দেশ্য যদি হয় নিছক যৌন তাড়না তাহলে বুঝতে হবে এখানে বিয়ের উদ্দেশ্য অনুপস্থিত।

উপরে কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করা হল। শিয়া ও সুন্নিদের বর্ণিত আরো বহু হাদীস রয়েছে।

জিম্মি মহিলাদের সম্পর্কে কথা হচ্ছে, তাদের দিকে যৌন কামনা নিয়ে বা অবৈধ উদ্দেশ্যে তাকানো যাবে না। একজন জিম্মি মহিলা বাড়ির বাইরে যে কাপড় পরে বের হয় তা পরিহিত অবস্থায় তার দিকে তাকানো যাবে। আয়াতুল্লাহ বুরজেরদী বলেন, সে যুগে যে পোষাক পরিধান করার রীতি তাদের মধ্যে ছিল সে সীমানা পর্যন্তই বিষয়টাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বর্তমানে মনে হয় নিয়ম অনেক পাল্টে গেছে এবং এখন তাদের শরীরের আরো অধিক অংশ অনাবৃত থাকে।

অন্য একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে হাদীসের আলোকে একটি ধর্মীয় নির্দেশ রয়েছে। কিছু ওলামা উহা গ্রহণে অসুবিধা রয়েছে বলে মনে করেন। ইমাম একটি হাদীসের আলোকে বলেছেন, বেদুঈন মহিলা, কুফা পল্লীর মহিলা অথবা

ইলজ্ (অনারব বেদুঈন মহিলা)-এর দিকে তাকানো কোন সমস্যার বিষয় নয়। কেননা, মাথায় কাপড় না দেয়া ছিল তাদের নিয়মরীতি। সুতরাং তাদের দিকে তাকানো নিষেধ নেই, তবে কামভাব নিয়ে নয়।

কিছু ওলামা হাদীসের আলোকে ধর্মীয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ কাযিম এ বিষয়ে রায় দেননি। তিনি বলেন, হাদীসে যে জিনিস বুঝানো হয়েছে তা হল, যেখানে এ ধরনের মহিলারা রয়েছে সে পথ দিয়ে পুরুষদের যাতায়াত বন্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়। এ সকল মহিলার চুলের উপর যদি তাদের চোখ পড়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। সেখানে যদি মহিলাদেরকে আচ্ছাদন দিতে বলা হয় এবং তারা সে কথায় কোন কর্নপাত না করে তাতে কোন সমস্যা নেই। অতএব তার মতে এটা ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা। এখানে ফতোয়া দেয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

অন্য একজন ফকিহ বলেন, শহরের মহিলাদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। যদি তাদের বলা হয় নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখতে এবং তারা তা' না করে সেক্ষেত্রে পুরুষেরা তাদের চুলের দিকে তাকালে কোন সমস্যা নেই।

গায়ের মাহ্রাম স্ত্রীলোকের কণ্ঠের আওয়াজ শোনা

অন্য একটি বিষয় হচ্ছে, গায়ের মাহ্রাম স্ত্রীলোকের কণ্ঠের আওয়াজ শোনা। ইহা কি নিষিদ্ধ? ইসলামী শরিয়ত মতে এ সম্পর্কে নিষেধ নেই। কিন্তু যৌন কামনা বা অবৈধ আকাঙ্খা নিয়ে হলে তা নিষিদ্ধ হাদীসে যে জিনিস বুঝানো হয়েছে তা হল, যেখানে এ ধরনের মহিলারা রয়েছে সে পথ দিয়ে পুরুষদের যাতায়াত বন্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়। এ সকল মহিলার চুলের উপর যদি তাদের চোখ পড়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যৌন কামনা বা অবৈধ আকাঙ্খা নিয়ে হলে তা নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে একজন অন্ধলোক হলেও একই কথা, কেননা সে অন্যের কথা শুনতে পায়। অবশ্য এ ব্যাপারে সাবধান বাণী রয়েছে যে, বিনা প্রয়োজনে গায়ের মাহ্রাম মহিলার কণ্ঠশোনা পরিহার করা উচিত। একজন মহিলার সুললিত কণ্ঠে ও আকর্ষণীয় সুরে কথা বলা নিষিদ্ধ। কেননা এতে যে ব্যক্তির মনে রোগ আছে সে তা শোনবে, ফলে তার মধ্যে কামভাব সৃষ্টি হতে পারে। এসব জিনিসে কোন অস্পষ্টতা নেই। এক গায়ের মাহ্রাম মহিলার স্বাভাবিক কণ্ঠ শোনার অনমুতি রয়েছে। কিন্তু যে কণ্ঠ কামভাব জাগ্রত করে এবং অন্যায় কাজের দিকে প্রলুব্ধ করে তা শোনা নিষিদ্ধ।

কোরআনের আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট। কোরআন একথা বলে না যে, মহিলারা কথা বলতে পারবে না। কোরআন বলেছে, তারা তাদের কণ্ঠের আওয়াজকে পরিবর্তন করবেনা। মহিলারা মহানবী (সঃ) ও ইমামদের নিকট অনবরত যাতায়াত করেছেন এবং তাদের প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করেছেন। বিষয়টি এখানে পরিষ্কার।

করমর্দন

অন্য একটি বিষয় হলো করমর্দন। অবশ্যই এ জাতীয় প্রশ্ন সেখানেই আসে যেখানে কামুকতা নেই অথবা পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অনুপস্থিত। অন্যথায় এসব অনুমোদিত নয়। পুনরায়, হাদীস এবং শরীয়ত এ ব্যাপারে পরস্পরকে সমর্থন করছে। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ)–কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "অনাত্মীয় কোন মহিলার সাথে করমর্দন কি অনুমোদিত?" তিনি বলেছেন, "না, হাতটি ঢাকা না থাকলে অথবা মহিলাটি মাহ্‌রাম না হলে অবশ্যই কেউ তার সাথে করমর্দন করবে না।" যে নারী মাহ্‌রাম নন তার সাথে করমর্দন করা চলবে না যদি না তার হাত কাপড়ে ঢাকা থাকে এবং এক্ষেত্রে চাপ দেয়াও নিষিদ্ধ।

ধর্মীয় ফতোয়া প্রসঙ্গে

এখানে অতিরিক্ত দু'টি বিষয় উল্লেখ করা উচিত। প্রথমটি হচ্ছে, এ পর্যন্ত আলোচিত বিষয়গুলো হাদিস ও কোরআনের আয়াতের আলোকে পেশ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এসব বিষয়ের উপর আর কারো কোন প্রশ্ন থাকবে না। এ বিষয়গুলো আমার সামনে এসেছে। যেহেতু এগুলো ফতোয়ার বিষয়, তাই সবাইকে মনে রাখতে হবে যে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি এখানে তুলে ধরেছি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উল্লেখিত প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছি। কিন্তু এ বিষয়টি এমন যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ীই তা মেনে চলতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল শরিয়তী ফতোয়ার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এ গুলোর সাথে তুলনাযোগ্য বড় বড় আলেমের দেয়া আরো কিছু ফতোয়া রয়েছে। কিন্তু

সে সকল ফতোয়ার পক্ষে কম সংখ্যক আলেম রয়েছেন, অধিকাংশ আলেম এ গুলোর সাথে একমত নন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, শেখ তুসী, শেখ হাদাইক এবং শেখ আনসারী একটি বিধানের কথা আলোচনা করেছেন। তারা তিন জনই শিয়া মতাবলম্বী খুব জ্ঞানী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্যদের মধ্যে আয়াতুল্লাহ হাকিম মুস্তামাস্ক গ্রন্থে এ সকল যুক্তি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যখন ধর্মীয় ফতোয়া প্রদানের প্রশ্ন আসে তখন তারা পিছিয়ে যান। মুসলমানদের আমল এ সকল দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী ছিল বলেই ফকীহ বিষয়টি ছেড়েদেন।

মুসলমানদের রীতিনীতি

এমন কিছু জিনিস আছে যা মুসলমানদের সমাজে প্রচলিত রীতি ও রেওয়াজের বিপরীত। কোরআনের আয়াত ও হাদীস বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে দেয়। মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত প্রথাসমূহ তাই ফেলে দেয়ার মত নয়। এ গুলো তাই ব্যাখ্যারদাবীরাখে।

আমরা যদি মনে করি যে মুসলমানগণ একটি প্রথা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মেনে চলছেন তাহলে এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তা নবী করীম (সঃ) এবং ইমামদের সময় থেকে চালু আছে। নবী করীম (সঃ) এবং ইমামদের নিকট থেকে মুসলমানরা তা শিখেছেন। সুতরাং এ প্রথা মহানবীর (সঃ) যুগে প্রচলিত ছিল এবং তা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। অবশ্য মুসলমানদের কোন প্রথাকে যুক্তি হিসেবে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণিত হবে যে তা মহানবী (সঃ) এর সময় চালু ছিল। চালু থাকলেই তা যুক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ দাঁড়ি রাখার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। অনেকেই বলেন, এটাও নবীজীর সময় হতে প্রচলিত রয়েছে এবং পরবর্তীতে সকলেই দাঁড়ি রেখেছেন। আমরা এটা বিশ্বাস করি। কেউ যদি বলে যে দাঁড়ি রাখা নিষেধ, তবে আমাদের বলা উচিত হবে, আগের মানুষ প্রথা অনুযায়ী দাঁড়ি রাখতো এবং তা প্রচলিত হয়েছে নবীজীর সময় থেকে। তাহলে ব্যাপার দাঁড়ায় যে দাঁড়ি রাখা নিষিদ্ধ ছিল না। যদি এটা নিষিদ্ধ হতো তবে তা কখনোই প্রথা হতো না। প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাহলে কি দাঁড়ি রাখাটা বাধ্যতামূলক না সুপারিশকৃত ব্যাপার? আরবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজাবের প্রচলন ছিল না। ইসলাম মাথা, ঘাড়, বুক ইত্যাদি ঢাকতে বলেছে এবং কামুকতার দৃষ্টিতে তাকাতে নিষেধ করেছে এর কিয়দংশ প্রাক ইসলামী যুগ হতে অনারবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইরানে হিজাবের প্রভাব খুব বেশী ছিল। ইহুদীদের মধ্যে বিশেষভাবে তা চালু ছিল এবং তাদের চিন্তার প্রভাব জনগণের উপরও পড়েছিল। আমরা মনে করি এটা প্রথার অংশ এবং কমপক্ষে তা অনুমোদিত এবং সুনির্দিষ্টভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। প্রথা সম্পর্কে তখনই কথা বলা হয় যখন এ ব্যাপারে কোন অশ্রদ্ধার ভাব থাকে। সুতরাং তা বাধ্যতামূলক অথবা এর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় আমার মাথায় এসেছে এবং তা ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়। ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ প্রায়ই এখানে এসে থেমে যাবার কারণ হল তারা সামাজিক দিকটিদেখেননি।

ইসলাম মুখ অনাবৃত রাখা বাধ্যতামূলক করেনি। তবে চুলঢাকাকে বাধ্যতামূলক করেছে। পরিষ্কারভাবে বলা যায়, যে জাতিগুলি ইসলাম গ্রহণ করতো, তারা তাদের প্রথাসমূহই অনুসরণ করতো। কারণ মুসলিম আইন বলেনি যে মুখ খোলা রাখতে হবে। ইসলাম শুধুমাত্র হারামশরীফে মুখ খোলা রাখতে বলেছে। কিংবা তাদের বলা হয়নি যে মুখ ঢাকা নিষেধ। এটা তাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইসলাম বিভিন্ন জাতিকে তাদের নিজেদের প্রথামতো পর্দাকে ব্যবহার করতে ছেড়ে দিয়েছে।

ইতিহাস প্রমাণ দেয়, অনারবীয়রা মনে করতেন যে, মুখ ঢাকা বাধ্যতামূলক। কাজেই এই মুখ ঢাকার প্রথা নবীজীর প্রবর্তিত নয় কিংবা ইমামদেরও প্রবর্তিত নয়।

অন্য একটি কারণ যা খুবই স্পর্শকাতর এবং বিবেচনাযোগ্য তাহলো সতর্কতা সম্পর্কিত। প্রত্যেক ফকীহ্ই সতর্কতার কথা বলেছেন। তারা (ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞরা) সবাই জানতেন যে, এ দুটো বিষয় আসবেই। একটি আছে পুরুষের মধ্যে এবং অপরটি আছে মহিলাদের মধ্যে। মহিলাদের মধ্যে যে জিনিসটা আছে তা হল নিজেকে প্রদর্শন করা এবং তা মহিলাদের স্বভাবের অংশ। পুরুষদের মধ্যে আছে তাকানোর প্রতি আকর্ষণ, তাকানোর জন্যে তাকানো নয়, বরং মেয়েদের মন পাওয়ার জন্যে তাকানো এবং এর মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা। এ দুটো জিনিসই আছে। উইল ডুরান্ট বলেন, একজন মহিলার দিকে একজন পুরুষের তাকানোর আকাঙ্খা এত নিশ্চিত এবং এ ব্যাপারে পুরুষের অধ্যবসায় এত বেশী যে পৃথিবীতে অন্য কোন কাজ এর সাথে তুলনীয় নয়। যতই অবদমিত করা হোক না কেন তবুও তা থাকে। হাদীসেও এ ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে। এ জন্যেই একজন ফকিহ এত সব কারণ ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে শরয়ী ফতোয়া প্রদান করতে সাহসী হন না। তারা বলেন, সতর্কতা বা তাকওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সতর্কতা বা তাকওয়ার ফতোয়া সংশ্লিষ্ট।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা এসে যায়। কিছু লোক একটা দর্শন মেনে চলে। তাদের এলাকায় এর আলোকে একটা রীতিনীতি চালু হয়। এ ব্যাপারে মানুষকে ভালমন্দ কিছু বলতে হয় না। কিছু বলার চেয়ে না বলাই তখন অধিকতর শ্রেয়।

আমি একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, একদিন আমি একটি চিঠি পাই আমার একটা বইয়ের প্রশংসা সম্বলিত। বইটির শিরোনাম ছিল, 'ভাল লোকের গল্প।' খুজিস্থানের নামাজের ইমাম বইটি পড়েছিলেন। তিনি বলেন, তিনি সবগুলো গল্প

ভালভাবে পড়েছেন, কোথাও কোন বিকৃতি চোখে পড়েনি। সেগুলো ছিল খুবই পাঠযোগ্য, মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে লেখা। অবশ্য তার দু'টি সমালোচনাও ছিল।

প্রথম সমালোচনাটি হযরত ফাতেমা (আঃ) এবং হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কিত। তাদের দু'জনেই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতেন। হযরত আলী (আঃ) বাড়ীর বাইরে কাজ করতেন এবং হযরত ফাতেমা (আঃ) করতেন বাড়ীর ভেতর। এ ধরণের ভাগ নবী করিম (দঃ) তাদের বিবাহের প্রথম দিকেই করে দিয়ে ছিলেন। যখন হযরত আলী (আঃ) বাড়ীতে থাকতেন, তখন তিনি হযরত ফাতেমা (আঃ)-কে সাহায্য করতেন। আর যখন হযরত আলী (আঃ) বাড়ী থাকতেন না তখন হযরত ফাতেমা (আঃ) বাড়ীর বাইরের কাজও করতেন। একদিন তিনি তার মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত কাপড়ে ঢেকে কূপ থেকে পানি আনার জন্য উনুনের কাছ থেকে দ্রুতবেগে বাইরে ছুটে যাচ্ছিলেন। কারণ তখন মদীনার কাছাকাছি পানি ছিল না। পানি ভর্তি চামড়ার থলের চাপে তাঁর শরীর ঢেকে গিয়েছিল। কেননা তিনি বাড়ীর জন্য অনেক পানি বহন করে আনছিলেন। ঐ লোকটি বলেন, এটি একটি সত্য গল্প এবং হাদীসের অংশ। এটার অপব্যবহার হতে পারে তাই এ গল্প বর্ণনা করা আমার উচিত হয়নি।

আমি সাধারণ নিয়মকে অস্বীকার করি না যে, যদি সত্য প্রকাশের কারণে লোকজন পথভ্রষ্ট হয়, তবে তা বলা উচিত হবে না। কারণ, সত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথমতঃ মানুষকে সঠিক পথ দেখানো, সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করা নয়। অবশ্যই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, "আমি মানুষের জন্য কিতাবে যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ করেছি উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপ দেয়ার অধিকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।" (২ঃ১৫৯) এ আয়াতের ভাষা খুবই কঠোর। এমন কড়া ও ক্রোধপূর্ণ আয়াতের সংখ্যা পবিত্র কোরআনে খুব কম পাওয়া যায়। একইভাবে আমি বিশ্বাস করি যে, লোকজন তাদের নিজেদের স্বার্থে সত্যকে গোপন করবে না, বরং সত্যের স্বার্থেই সত্যকে গোপন করবে এবং তা হবে খুব সীমিত, সাময়িক ও সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে। যাতে করে এর অপব্যবহার না হয়। এ আয়াতে এ ধরনের সত্য গোপনকারীদের সম্পর্কে বলা হয়নি।

আমি বিশ্বাস করি যে, এটা এক ধরণের দূরদর্শিতা। ঐ সত্য যদি সঠিক সত্য হয় তাহলে সত্যটি কোন সমস্যা নয়। কিন্তু যখন বিষয়টি ব্যক্তিগত অথবা দলগত ভিত্তিক হয়, তখন তা আর দূরদর্শিতা নয়।

একটি রেডিও কেনা বা বেচা বাধ্যতামূলক কিনা সে সম্পর্কে কোন ধর্মীয় ফতোয় দেয়া তখন একজন নারীর জন্য তার মুখ ও হাত ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক কিনা সে সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া কি বিচক্ষণতা নয়? এটা কি সঠিক ধরণের চিন্তা? এটা কি বিচক্ষণতা? এ থেকে কি সঠিক ফল পাওয়া যাবে? কিছু মহিলা যারা মুখ ও হাত ঢেকে রাখতে অভ্যস্ত তারা কি এখন এ সত্য বলার ফলে তাদের মুখ ও হাত নগ্ন রাখবে এবং পরে পুরোশরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলবে?

অনেক মহিলা ও পুরুষের ধারণা যে শরিয়তী বিধানের মূলকথা হল একজন মহিলা তার মুখ কাউকে দেখাবে না। কেন না মুখ দেখানোর পর বাকী অংশ দেখানোর ব্যাপারে আর বাধা থাকে না। অন্যদিকে মুখ ঢেকে রাখা অবাস্তব এবং অযৌক্তিক ব্যাপার। মুখ ঢেকে রাখার পক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণ যেহেতু দেয়া যাবে না তাই তারা শেষ পর্যন্ত পুরো শরীর থেকেই পর্দা খুলে ফেলে।

কতিপয় সমাজ বিজ্ঞানীর ধারণা, হিজাব সম্পর্কে সমাজে ভুল ধারণা থাকার ফলেই মহিলারা পোষাকের ব্যাপারে প্রান্তিক মনোভাবাপন্ন হয়েছে এবং তাদের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা দেখা দিয়েছে। সত্য কথা প্রকাশ না করে আরো ভুল করা হয়েছে। ইসলামী বিধান যা দাবী করে, তা যদি যথাযথভাবে বলা হত তাহলে অবস্থা কখনো এ পর্যায়ে পৌঁছতো না। এখানেই সেই প্রবাদবাক্য প্রযোজ্য যেখানে বলা হয়েছে,'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী' অথবা 'কড়াই থেকে উনুনে' পড়া।

পবিত্র কোরআনের সুরা হুজরাতে বলা হয়েছে, 'হে মোমেনগণ, আল্লাহ ও তার রাসুলের চেয়ে অগ্রণী হয়ো না।' এখানে অগ্রণী না হওয়ার অর্থ কি তা বুঝতে হবে। এর অর্থ হল আল্লাহ ও তার রাসুল (সঃ) যা বলেছেন, তা থেকে এগিয়ে যাওয়া।

আমীর-উল-মুমেনিন হযরত আলী (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ কতিপয় সীমা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা লংঘন করো না। তিনি নিষেধাবলীও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; সেগুলো অমান্য করো না। তিনি বাধ্যবাধকতাগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা' পরিহার করো না; কিছু বিষয়ে তিনি নীরব (এসব বিষয় নিষেধও নয় আদেশও নয়।) এজন্য না যে তিনি তোমাদেরকে এসব বিষয় থেকে মুক্ত দেখতে চান। কাজেই তোমাদের নিজেদের জন্য নিজেরা বাধা সৃষ্টি করো না। আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর নামে নিজেদের কর্তব্য পালন করে যাও।

নবী করিম (দঃ) বলেছেন, যা' "জামে আল-সাগীর কিতাবে উল্লেখ আছে," "খোদা ঐসব অপছন্দ করেন যা তিনি নিষেধ করেছেন এবং সকলের তা মেনে চলা

কর্তব্য। তিনি পছন্দ করেন তাদের যারা তার অনুমোদিত কাজ করে। এ ছাড়া বাকী যা আছে তাতে কোন অসুবিধা নেই, সেগুলোকে এভাবেই দেখতে হবে। খোদা যা নিষেধ করেননি তা কারও নিষেধ করা উচিত নয়।"

এ হাদীসটিও উল্লেখিত হয়েছে, 'আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল করে এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা মেনে চলে।'

আমার মনে হয় আমি ভুল করে ফেলেছি। ধর্মীয় ফতোয়ার আওতাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আমি কথা বলে ফেলেছি। এ ব্যাপারে কথা হল, প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজেদের মুজতাহিদের রায়ই মেনে চলবে।

কিন্তু আমি এ কথার সাথে একমত নই যে উল্লেখিত বিচক্ষণতার নাম নিয়ে কোন কোন বিষয় সত্য হলেও তা প্রকাশ করা যাবে না। আমি বিশ্বাস করি সত্যকে প্রকাশ করাই উত্তম। আরো করণীয় কাজ হল, যে সকল মহিলা বলেন, 'হিজাব অবাস্তব একটি বিষয়' তাদের ভ্রান্তি তুলে ধরা। তাদের সামনে আমাদের এ প্রমাণ উপস্থাপিত করতে হবে যে ইসলামী হিজাব যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের বিশেষভাবে মেয়েদের জন্যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে ইউরোপের অনুকরনে পরিচালিত তৎপরতাকে প্রতিরোধ করতে হবে। একমাত্র এভাবেই নারী সমাজ তাদের সত্যিকার পরিচয় আবিষ্কার করবে এবং হয়ত বা তারা আর স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে পুরুষের যৌন লালসা পূরণের হাতিয়ার, খেলনা এবং মাধ্যমে পরিনত হবেনা।

ধর্মীয় বিধান

আমরা উপরের আলোচনায় নির্ভর যোগ্য সূত্র এবং মহানবী (সঃ) ও মাসুম ইমামদের আমলের আলোকে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করেছি। আমরা ইসলামের মৌলিক নীতি ও ভারসাম্যমূলক বিধানের ভিত্তিতে একথা প্রমাণ করেছি যে মুখ ও হাত ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়। আমরা এও দেখেছি যে যৌন কামনা বা অবৈধ কাজের ভয় না থাকলে (স্বামী–স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যতিক্রম রয়েছে) নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকানো অনুমোদনযোগ্য হওয়ার ব্যাপারেই ইসলামী বিধান জোর দেয়। এখন আমরা সংক্ষেপে ফকিহদের রায় নিয়ে আলোচনা করব। কারণ একথা জানা আবশ্যক যে ইসলামের শুরু থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত তারা বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমে মুখ ও হাত ঢেকে রাখা সম্পর্কে ফকিহদের অভিমত নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকানোর ব্যাপারে তাদের রায় ব্যক্ত করা হবে।

শিয়া–সুন্নি নির্বিশেষে প্রায় সকল ফকিহই এ ব্যাপারে একমত যে হাত ও মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়। একজন সুন্নি ফকিহ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন এবং তিনি আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হিশাম। কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় যে তিনি কি শুধুমাত্র ফরজ নামাজের সময় হাতমুখ ঢেকে রাখার কথা বলেছেন, নাকি গায়র মাহরামদের সামনেও ঢেকে রাখার কথা বলেছেন।

মুখের ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য না থাকলেও 'কব্জি পর্যন্ত হাত' এবং 'গোড়ালি পর্যন্ত পা' ঢেকে রাখা সম্পর্কে ফকিহদের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। কব্জি ও গোড়ালি ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত কিনা তাই হল মত পার্থক্যের বিষয়। তাদের বক্তব্য উল্লেখ করার পূর্বে দুটো বিষয় মনে রাখা দরকার। এক, ফেকাহ শাস্ত্রে দুটো স্থানে পর্দার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ ফরজ নামাজের সময় মহিলাদের জন্যে গোটা শরীর ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। তখন সেখানে গায়র মাহরাম কেউ উপস্থিত থাকুক অথবা নাই থাকুক। এখানে প্রশ্ন হল, এ সময় হাত ও মুখ ঢেকে রাখতে হবে কিনা।

দ্বিতীয়ত ঃ বিবাহ বিষয়ক আলোচনায় পর্দা সম্পর্কে কথা এসেছে। বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একজন পুরুষ একজন মহিলাকে দেখতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল

পাণিপ্রার্থী পুরুষ সে মহিলার শরীরের কতটুকু দেখতে পারে? এখানে প্রধানতঃ পর্দা সম্পর্কে এবং মহিলাদের প্রতি তাকানোর বৈধতা প্রসঙ্গে একটা সাধারণ আলোচনা করাহয়েছে।

ফকিহদের মতে দু'ধরনের আচ্ছাদন রয়েছে। এক প্রকার আচ্ছাদন ফরজ নামাজের সময় পরিধান করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। এর জন্যে কতিপয় পূর্বশর্ত রয়েছে, যেমন পবিত্র হতে হবে, ও ... হবে না ইত্যাদি। অপর প্রকার আচ্ছাদন গায়র মাহরাম পুরুষের সামনে ব্যবহার ... বাধ্যতামূলক। ফরজ নামাজের সাথে এর সম্পর্ক নেই। আমরা পরে আলোচনা করে একথা পরিষ্কার করব যে ঢেকে রাখার সীমানার দিক দিয়ে ফরজ নামাজের সময়ের আচ্ছাদন এবং মাহরাম পুরুষের সামনে ব্যবহৃত আচ্ছাদনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি যা এখানে উল্লেখযোগ্য তাহল ধর্মীয় আইনজ্ঞরা একটি পরিভাষা ব্যবহার করেন এবং তা মুখাবয়ব এবং দুহাত ছাড়া সমগ্র দেহকে বুঝানোর জন্য। এ পরিভাষাটি হল 'আওরাহ' যার অর্থ 'উম্মোচিত', শূন্য বা নগ্ন।

এ পরিভাষা কিছু লোকের কাছে আকর্ষণীয় মনে না হতে পারে। কেননা এদ্বারা নগ্নতাকে বুঝানো হচ্ছে। আমরা তখন প্রশ্ন রাখতে পারি, নারীর শরীর, তাদের হাত ও মুখাবয়ব ছাড়া বাকী অংশ ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে কি কুৎসিৎ বা অনাকর্ষণীয় নয়?

উত্তর হল আওরাহ শব্দটি কোনভাবেই এমন কিছুকে ইংগিত করে না যা কুৎসিৎ অথবা আকর্ষণীয় নয়। প্রথমতঃ সব কুৎসিৎ কাজকে আওরাহ দ্বারা নির্দেশ করা হয় না। এরং সাথে সাথে এর বিপরীত কথাটিও সত্য। আওরাহ শব্দটি প্রায়ই এমন সব জিনিস বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে যার সাথে কুৎসিত অর্থটার কোন সম্পর্কই নেই। পবিত্র কোরানের আয়াতে এই শব্দটি উন্মুক্ত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, "সত্যিকার আমাদের ঘরগুলি খোলা" (৩৩ঃ১২)।

এই অজুহাতে তারা যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল। এটা পরিষ্কার যে তাদের বসতবাটীর ক্ষেত্রে কুৎসিৎ শব্দটি কখনোই ব্যবহার করা হয়নি।

২৪ঃ৫৯, আয়াতে বলা হয়েছে যে মাহরামরা পর্যন্ত কারো একান্ত ব্যক্তিগত ভুবনে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা করবে (স্বামী-স্ত্রী ব্যতিক্রম) তিনটি সময়। এক্ষেত্রগুলোকে 'তিন আওরাহ'র সময় বলা হয়।

মাজমা-উল-বয়ানের লেখক যিনি নিজে একজন শব্দকোষ বিশেষজ্ঞ এবং এ বিষয়ে অতুলনীয় জ্ঞানী, (৩৩ঃ১৪) আয়াতে উল্লেখিত 'আউরাহ' শব্দটি দ্বারা এমন

হাশিম বিশ্বাস করেন যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়া মেয়েদের সম্পূর্ণ শরীর 'আওরাহ।'

শেখ জাওয়াদ মুকনিয়া তার 'আল ফিক্‌হ আলাল মাজাহিব আল খামাসাহ' গ্রন্থে লিখেন, ''সকল মুসলিম আলিম একমত যে একজন পুরুষ বা একজন মহিলার জন্যে ফরজ নামাজের বাইরে শরীরের যতটুকু অংশ ঢেকে রাখা আবশ্যক ফরজ নামাজের সময় ততটুকু অবশ্য ঢেকে রাখতে হবে। কতটুকু ঢেকে রাখতে হবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মহিলাদের জন্যে ফরজ নামাজের সময় মুখ ও হস্তদ্বয় ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক কিনা এবং পুরুষদের জন্যে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশের অতিরিক্ত কোন অংশ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।'' তার পর তিনি লিখেন, ইমামিয়া শিয়া আলেমদের মতে ফরজ নামাজ পড়াকালীন সময় ছাড়া অন্য সময় একজন অমাহরাম পুরুষের সামনে একজন মহিলাকে শরীরের যতটুকু অংশ ঢেকে রাখতে হয়, ফরজ নামাজের সময় ও তার জন্যে সে অংশ ঢেকে রাখা

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছু সমসাময়িক উলেমার মতে, বিগত কালের আলেমগন মুখ ঢেকে রাখা অত্যাবশ্যক মনে করতেন এবং তাদের সে চিন্তা ভুল ছিল।

তাকানোর বৈধতা সম্পর্কে আল্লামা লেখেছেন, "একজন মহিলার প্রতি একজন পুরুষের দৃষ্টিপাত অথবা একজন পুরুষের প্রতি একজন মহিলার দৃষ্টিপাত হয় আবশ্যক (যেমন, একজন পাণিপ্রার্থী বা পাণিপ্রার্থিনী) নতুবা অনাবশ্যক। যদি আবশ্যক না হয় তবে মুখাবয়ব ও হস্তদ্বয় ভিন্ন অন্য কোন অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাবে না। আর এতেও যদি ভ্রষ্টতার ভয় থাকে তবে তাও নিষিদ্ধ। অধিকাংশ সুফি–মতাবলম্বিগণ এই মতামতে বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের কারো কারো মতে মুখাবয়ব ও হস্তদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ।"

মুখাবয়ব ও হস্তদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাতের সম্পর্কে মূলতঃ তিনটি মতামত বর্তমান। প্রথম মত অনুসারে "জাওয়াহিরের লেখকসহ স্বয়ং আল্লামার মতে হস্তদ্বয় ও মুখাবয়বের দিকে দৃষ্টিপাত সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় মত অনুসারে, একবার দৃষ্টিপাত অনুমোদিত, কিন্তু পুনঃ দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ। মুহাক্কিক তার শারাইতে, শহীদ আউয়াল তার 'লুমাআ'তে এবং আল্লামা তার অন্যান্য গ্রন্থে এ বিষয়ে এ মত প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় মত অনুসারে, "এটা সম্পূর্ণভাবে যায়েয বা অনুমোদিত।" শেখ তুসি, হাদাইকের লেখক কুলাইনী, শেখ আনসারী, মুস্তানাদের লেখক নারাকী এবং মাছালিক–এর লেখক শহীদ ছানি এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। শহীদ ছানি আল্লামা কর্তৃক অনুমোদিত

কিছুকে বুঝাতে চেয়েছেন যার ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে কোন ব্যক্তি সর্বদা উৎকণ্ঠিত বা উদ্বিগ্ন থাকেন। উদাহরণস্বরূপ তা দেশের সীমান্ত এলাকা কিংবা যুদ্ধসম্পর্কিত কোন বিষয়ের কথা বলা যেতে পারে। একটি উন্মুক্ত খোলা স্থান বা বাড়ি হচ্ছে অরক্ষিত স্থান যে স্থানের ক্ষয়ক্ষতি খুব সহজেই হয়ে যায়।

একথা পরিষ্কার যে ফকিহগণ হীন বা দুর্বল বুঝাতে শব্দটি ব্যবহার করেননি। মেয়েদের শরীরকে স্পর্শকাতর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মহিলাদের শরীর সেই ঘরের মত যে ঘরের কোন দেয়াল নেই এবং সহজেই যার ক্ষতি করা যায়। সুতরাং তা কোন প্রকার বেষ্টনী দিয়ে ঘেরাও করে রাখতে হবে।

এখন দেখা যাক শরিয়ত এ ব্যাপারে কি বলে। আল্লামা তার তাজকেরাতুল ফুকাহা গ্রন্থে লিখেন, মেয়েদের মুখ ছাড়া পুরো শরীরই 'আওরাহ' (স্পর্শকাতর)। বিভিন্ন শহরের সকল আলেমই এ ব্যাপারে একমত, শুধুমাত্র আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান হিশাম দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, মেয়েদের পুরো শরীরই 'আওরাহ'। তার মতকে সংখ্যালগিষ্ঠের মত বলে বিবেচনা করা হয়।

শিয়া ওলামাদের মতে কব্জি অবধি দু'হাত হচ্ছে মুখাবয়বের মত এবং এগুলো আওরাহ্ নয়। মালিক ইব্ন আনিস, শাফেয়ী আউজায়ী এবং সুফিয়ান ছাওরি এ বিষয়ে শিয়া ওলমাদের সাথে একমত। কেননা ইব্নে আব্বাসের (রাঃ) মতে রাসূল (দঃ) বলেন, "মুখাবয়ব ও হস্তদ্বয় ব্যতিক্রমগুলোর অন্তর্ভুক্ত।" কিন্তু আহমদ হাম্বল এবং দাউদ জাহিরির মতে, হস্তদ্বয় অবশ্যই আবৃত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃত হাদীস–ই উক্ত মতকে খণ্ডানোর জন্য যথেষ্ট।

তারপর আল্লামা দু' পা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, দেখা গেছে ফকিহগণ সুরা নূরের উদ্ধৃতি দিয়ে ফরজ নামাজে আবৃত রাখার সীমানার কথা বলেন। কিন্তু ফরজ নামাজের কথা সেখানে বলা হয়নি। ফরজ নামাজে যতটুকু ঢেকে রাখতে হবে ততটুকু অমাহরামদের সামনে অবশ্যই ঢাকতে হবে। মত পার্থক্য থাকলে ফরজ নামাজের সময় আরো বেশী অংশ ঢাকতে হবে কি না নিয়ে আছে। কিন্তু ফরজ নামাজে যে অংশ না ঢাকলে চলে সে অংশ অমাহরামের সামনে ঢেকে রাখার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে মত পার্থক্যের কোন অবকাশ নেই''

প্রসিদ্ধ স্পেনীয় ফকিহ, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক ইবনে রুশদ লিখেন, অধিকাংশ আলেমের মতে মেয়েদের মুখ ও দু'হাত ছাড়া পুরো শরীরই 'আওরাহ'। আহমদ হানিফের মতে, দু'পাও 'আওরাহ' এর বাইরে। আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান

অনুমোদিত শাফেয়ীর মতামতকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে মনে করেন। তবে তিনি পরিশেষে বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, সতর্কতা অবলম্বন উত্তম।"

উপরোক্ত আলোচনা ছিল অতীতের–ধর্মবিশারদগণের মতামত। কিন্তু আধুনিক ধর্মবিশারদগণ উপরোক্ত বিষয় দুটোর উপর সরাসরি মতামত ব্যক্ত করেন না। বরং প্রায়শঃ তারা 'সতর্কতা' কথাটি ব্যবহার করে বিষয় দুটো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আধুনিক ধর্মবিশারদগণের মধ্যে আয়াতুল্লাহ হাকিম তার মিন্‌হায আল–সালিহীন, নবম সংস্করণ বিবাহ অধ্যায়ে এ বিষয়ে সরাসরি মতামত প্রকাশ করে বলেন যে, মুখাবয়ব ও হস্তদ্বয় ব্যতিক্রম। "এটা অনুমোদিত যে, একজন ব্যক্তি অন্য একজন কাঙ্খিত ব্যক্তির (যাকে সে বিয়ে করতে চায়) দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে। একইভাবে দৃষ্টিপাত করতে পারবে 'জিম্মি মহিলাগণের দিকেও যদি তাতে কামুকতা না থাকে। এক্ষেত্রে মাহরাম রমণীগণও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই পরনারীর মুখাবয়ব ও হস্তদ্বয় ভিন্ন অন্য কোন অংগের দিকে দৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ এবং তাতেও শর্ত এই যে, সেই দৃষ্টিতে কামুকতা থাকতে পারবে না।"

পঞ্চমঅধ্যায়েরটীকাঃ

১· ওয়াসাইল, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫

২· ওয়াসাইল, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৯

৩· ওয়াসাইল, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৯

৪· ওয়াসাইল, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৬

৫· আয়াতুল্লাহ সায়েদ মুহাম্মদ কাযেম তাবাতায়ী ইয়াজদী, "ওরওয়াতুল ওসাকা" বিবাহ পরিচ্ছেদ, প্রথম অধ্যায়, ইস্যু–৩৯

৬· ঐ

৭· এই অধ্যায়ের শেষ অংশ মোতাহারী সংযুক্ত।

৮· কোরআন, ৩৩ঃ১৪

৯· মাজমা–আল–বায়ান, কোরানের আলোচনা, ৩৩ঃ১৪

১০· বিদায়েত–আল–মুজতাহিদ, প্রথম খন্ড, পৃঃ১১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী হিজাব—চতুর্থ অংশ

অনুমোদনযোগ্য সুবিধা ও অসুবিধা

পূর্ববর্তী আলোচনার উপসংহার হিসেবে এখানে দুটো বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতিতে দুটো পরিভাষা আছে যা এখানে আমাদের কাজে লাগবে। কিছু বিষয় এমন যে সেগুলো বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে দলিল নেই এবং নিষিদ্ধ হওয়ার মত ঘৃণ্যও নয়। যেহেতু এগুলো 'আদেশ' বা 'নিষেধের' আওতাভুক্ত হওয়ার মত নয় এজন্যে এগুলো গ্রহণীয়। এগুলোকে গ্রহণযোগ্য অসুবিধা বা মোবাহ লা ইকতিদায়ী বলা হয়। সম্ভবতঃ অধিকাংশ মোবাহ ই এ রকম।

আরো কিছু গ্রহণযোগ্য বিষয় রয়েছে। বিশেষ বিচেনার কারণে সেগুলো গ্রহণযোগ্য হয়েছে। শরিয়ত যদি এগুলোকে বৈধতা প্রদান না করে তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি অশুভ প্রভাব দেখা দিবে। এ ধরনের বিষয়গুলোকে গ্রহণযোগ্য সুবিধা বলা হয়। গ্রহণ বা বর্জন করার মত শুভ বা অশুভ উপাদান এগুলোতে থাকলেও বৃহত্তর সুবিধার জন্যে শরিয়ত অন্যান্য দিক উপেক্ষা করে এগুলোকে গ্রহণ করেছে।

কোন দোষ বা ত্রুটি (হারাজ) নেই হিসেবে যেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো এ রকম। ফকিহগণ বিবেচনা করে দেখেছেন যে তারা যদি কিছু কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন তাহলে মানুষের জন্যে জীবন যাপন কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তারা এগুলো নিষিদ্ধ করেননি।

এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে বিবাহ-বিচ্ছেদ। নবী করিম (দঃ) বলেছেন, "সকল গ্রহণযোগ্য বিষয়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ সবচেয়ে ঘৃণিত।" কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, "কাজ যদি ঘৃণিতই হয় তা'হলে কেন অনুমোদনযোগ্য? বিচ্ছেদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত।" কিন্তু না। যদিও এটা একটি অতীব ঘৃণিত কাজ এবং এটা বেহেশতকে পর্যন্ত নাড়া দেয় তথাপি এটা নিষিদ্ধ নয়।

আবু আইয়ূব আনসারী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন। এব্যাপারে নবী করিম (দঃ) বললেন, "উম্মে আইয়ূবকে তালাক দেয়া একটা পাপ।" কিন্তু তারপরও যদি আবু

আইয়ূব তার স্ত্রীকে তালাক দিতেন, তাহলে নবী করিম (দঃ) বলতেন না যে তালাক সে অকার্যকর হবে। কিছু বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা নেই। নিষিদ্ধ হওয়ার মত কিছু উপাদান তাতে রয়েছে। এ জন্য তা ঘৃণিত কিন্তু নিষিদ্ধ নয়।

এর কারণ হল ইসলাম বিবাহকে বাধ্যতামূলক করতে চায়নি। অর্থাৎ ইসলাম একজন পুরুষকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে চায়নি যে সে একজন মহিলার সাহায্যকারী ও হেফাজতকারী হবে এবং যে কোন মূল্যে নিজ স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বিবাহ বিচ্ছেদ যাতে না হয় সে ব্যাপারে ইসলাম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পুরুষের যেহেতু স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ রয়েছে সেহেতু তার কর্তব্য হল স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করা এবং তার সাথে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু পরিস্থিতি যদি ভিন্ন রকম হয়ে যায় এবং পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তখন কি করবে? তালাককে একটি ঘৃণিত জিনিস বলা হয়েছে যেন একজন মানুষ বাধ্য না হলে তালাক দিতে না যায়। গ্রহণযোগ্য সুবিধার এ একটি দৃষ্টান্ত।

এ জাতীয় ব্যতিক্রম হিজাব এবং হিজাবের সীমানার ব্যাপারেও রয়েছে। যেমন একজন মহিলার জন্যে মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক নয় এবং দৃষ্টিতে যদি কামভাব না থাকে তাহলে পুরুষের জন্যে মহিলাদের মুখের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ নয়। মুখ খোলা রাখা ও ঢাকা রাখা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য সুবিধার একটি দৃষ্টান্ত। চুলের মধ্যে যে দিকগুলো পাওয়া যায় মুখের মধ্যেও সেগুলো আছে। মুখের সাথে তুলনা করলে গোটা শরীরেই মুখের বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। শরীরে আরো কিছু অংশ আছে যেগুলো মুখের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় না হলেও কম আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু এর পরও বিধানের দিক দিয়ে এ পার্থক্য রয়েছে। মুখ ও চুল একই ধরনের হলেও কোন মহিলাকে চুল ঢাকার কথা বললে তা পালন করা তার জন্যে কঠিন নয়। অবশ্য সে যদি উদ্ধত স্বভাবের হয় এবং নিজ চুল খোলা রাখার ব্যাপারে একগুয়ে মনোভাবের অধিকারী হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

এটা এমন একটি কর্তব্য যা' কোন নারীকে বিপদে ফেলে না। এমনকি এটা স্ত্রীদের উপর স্বামীর হস্তক্ষেপও নয়। কিন্তু যদি একজন স্ত্রীলোককে বলা হয় যে, সে যেন তার মুখও ঢেকে রাখে, তাহলে তাকে বহু কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে তার কাজের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়। এমন অনেক কাজ আছে যা একজন মহিলার মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক কিনা, মহিলাদের গাড়ী চালনার ব্যাপারে অনুমোদন আছে কি নেই প্রভৃতি ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানের উপর নির্ভরশীল। এ প্রশ্নগুলোকে সামাজিক কর্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে।

একজন যখন বলেন, ' না মেয়েদের জন্যে মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়' তখন এর অর্থ হল সে গাড়ি চালাতে পারবে। গাড়ি চালাতে হলে শরীরের অন্যান্য অংশ দেখাতে হয় না। মেকআপ করার প্রয়োজন পড়ে না অথবা চুল খোলা রাখতে হয় না। শুধু মুখের গোলাকার অবয়ব দেখা গেলেই সে গাড়ি চালাতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন মহিলা শিক্ষিকা কি পুরুষ ছাত্রকে পড়াতে পারে? আমরা উল্লেখ করেছি একজন অ-মাহরাম মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা সমস্যা নয়। এখন যদি আমরা বলি কোন পুরুষের একজন অ-মাহরাম মহিলার দিকে তাকানো অনুমোদিত নয় এবং একজন মহিলার মুখ আচ্ছাদিত করা বাধ্যতামূলক, তা'হলে আমরা বলবো তা' অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু যদি আমরা বলি মহিলাদের মুখ ঢাকা বাধ্যতামূলক নয়, এবং এটা অনুমোদিত যে, একজন পুরুষ একজন অ-মাহরাম মহিলার দিকে তাকাতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কামুকতার দৃষ্টি নিয়ে না তাকায়, কেবল তখনই সে পুরুষ ছাত্রদের শিক্ষিকা হতে পারে অর্থাৎ সীমানা হচ্ছে হাত এবং মুখ। আসল কথা হল মহিলারা ঘরে বসে থাকবে কি থাকবে না। বিষয়টি ছোটখাটো বিষয় নয়।।

আমরা এ সিদ্ধান্ত যদি নেই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে একজন স্ত্রীলোকের মুখ-হাতসহ সর্বাঙ্গ আবৃত থাকা বাধ্যতামূলক এবং একজন মহিলার মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ঢেকে রাখা উচিত, তাহলে এর অর্থ এই যে একজন মহিলার কর্মতৎপরতা তার ঘরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা তার পক্ষে বাড়ীর বাইরে কাজ করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ যেসব স্ত্রীলোক বিশ্বাস করেন যে, তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আচ্ছাদন রাখতে বাধ্য তারা শাকসব্জী ক্রয় করার জন্য বাইরে যেতে পারে না। এ কাজের জন্য তারা স্বামী বা চাকর পাঠাবেন। এ'ভাবে বলা যায় এটার মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান আছে যে, তাদের হাত-মুখ আবৃত করা বাধ্যতামূলক কিনা। প্রকৃতপক্ষে তখন তাদের কর্মকান্ডের এলাকা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে।

আমরা কোরআনের আয়াত ও হাদীস হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, এতে আমরা কিছু হারাচ্ছি না কিংবা অনুমানের ভিত্তিতেও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছেনা। শুধুমাত্র আমরা দেখতে পেয়েছি ধর্মীয় নির্দেশের অভাব। কিন্তু ধর্মীয় বিধান মুখ এবং হাত ঢাকার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক নিদের্শ দেয়নি।

একজন বেগানা রমণীর মুখের দিকে একজন পুরুষ, যদি তার দৃষ্টিতে খারাপ ভাব নাও থাকে, তাকাতে পারে কিনা--এ সম্পর্কে ধর্মীয় ফতোয়া অনুপস্থিত বলে ধারণা করা হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে তাকানো বৈধ নয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ আলেম শেখ আনসারী বলেন, এটা অনুমোদিত। কোরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা বলেছে।

প্রশ্ন হতে পারে, চুল এবং মুখের মধ্যে পার্থক্য কি? যে সব বৈশিষ্ট্য চুলের ক্ষেত্রে খাটে তা কি মুখাবয়বের ক্ষেত্রেও খাটে না? এভাবে তা কি চোখ এবং ভ্রুর ক্ষেত্রেও খাটে না? এক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর হল, এটা হল গ্রহণযোগ্য সুবিধা, গ্রহণযোগ্য অসুবিধা নয়। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে একটির মধ্যে যে সকল বিষয় পাওয়া যায় অন্যগুলোর মধ্যে সেগুলো পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে সকল ব্যতিক্রমগুলো রয়েছে সেখানে উদাহরণ স্বরূপ সৎপুত্রের কথা বলা যায়। সাধারণত দু'টি ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো। পিতা, শিশু, পুত্র, স্বামী, ভাই, শ্বশুর ইত্যাদি ব্যক্তির সামনে আচ্ছাদন দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। এখানে দু'টি মানদন্ডের অস্তিত্ব বিরাজমান। প্রথমতঃ একজন গায়ের মাহরাম থেকে পিতা ও চাচার চাহনির পার্থক্য। এটা সাধারণ ব্যাপার যে, একজন পিতা তার কন্যার দিকে কামুক দৃষ্টিতে তাকায় না। এমনকি একজন পুত্রও তেমনি মায়ের দিকে তাকায় না। ভাই ও চাচার ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য। কিছু আত্মীয় রয়েছেন, তাদের বেলায় তা প্রযোজ্য নহে। পিতা যে অনুভূতি নিয়ে মেয়ের দিকে তাকায় স্বামীর অপর পক্ষের ছেলে কি একজন মহিলার দিকে সেই অনুভূতি নিয়ে তার দিকে তাকাতে পারে? মেয়ে যদি বিশ্বসুন্দরী হয় তবুও পিতার দৃষ্টি অন্যরকম হবে। একজন পুরুষ যদি তার ছেলের বয়সী স্ত্রী বিয়ে করে তখন পরিস্থিতি কি রকম হবে? শ্বশুরের বেলায় একই কথা খাটে। এসব আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা নেই। এটা একটি কঠিন ব্যাপার। একই বাড়ীতে পিতা-পুত্র বসবাস করে। পিতা অন্য একটি বিয়ে করতে পারে কিন্তু পুত্র বাড়ীর একজন অধিকারভুক্ত সদস্য। তেমনি বিয়ের পর স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত সদস্য হিসেবে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। সে কারণেই একই বাড়ীতে বসবাস করে পিতার স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর পুত্র এবং অন্যান্য সদস্যের সম্মুখে আচ্ছাদিত থাকা দুরূহ ব্যাপার।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে যে আলোচনা করা হল সে বিষয়ে এখানে উপসংহার টানতে চাই। বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত। এ' ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে ব্যাপারটা ঘৃণিত। যদি একজন মানুষ জিজ্ঞেস করে "যদি আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই, আমি কি সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি পাব? আমার তালাক দেয়া উচিত হবে কি হবে না?" তালাক না দিলেই ভালো হয়। একই ভাবে অ-মাহরাম মহিলার দিকে তাকানো নিষিদ্ধ নয় যদি কামভাব বা পথভ্রষ্টতার ভয় না থাকে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে "তাকানো ভালো-না, না তাকানো ভাল।" এর উত্তর হল না তাকানো অবশ্যই ভাল।

একজন মহিলার মুখ আচ্ছাদন করা ভালো কি মন্দ? এটা অবশ্যই ভালো। গায়ের মাহরাম মহিলার দিকে না তাকালেই ভাল, যদিও তা' অনুমোদিত।

হাদীস এবং বর্ণনাসমূহ

এ' বিষয়ের উপর ধারাবাহিক হাদীস রয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা যে সকল হাদীস উপস্থাপন করেছি সেখানে মৌলিক কথা ছিল, একজন পুরুষ একজন অ-মাহরাম মহিলার দিকে তাকাবে না। এরূপ অন্য আর এক প্রকার হাদীস রয়েছে যে গুলোর ধারাবাহিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং ওলামাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। কিন্তু সে গুলো বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে এবং প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারনে সহায়ক।

হযরত আলীর (আঃ) বিখ্যাত চিঠি রয়েছে, যে চিঠিটা তিনি ইমাম হাসান (আঃ) কে উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন। উপদেশটি হচ্ছে, "যথাসম্ভব তোমার স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে অন্যের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত রাখবে। একজন স্ত্রীর জন্য বাড়ীর চেয়ে উত্তম রক্ষক নেই।" হাদীসে 'ইহতিযাব' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে পর্দার মধ্যে লুকায়িত। তিনি মালিক আল আশতারকে বলেছিলেন, "নিজেকে জনসাধারণ থেকে আলাদা (ইহতিযাব) রেখো না।"

ইমাম মহিলাদের অ-মাহরাম পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন। এটা মহিলাদের জন্য কল্যাণকর। এটা সত্য যে, মহিলাদের অ-মাহরাম পুরুষদের থেকে যত দূরে থাকবে তত বেশী বিচ্যুতির মাত্রা হ্রাস পাবে। যেহেতু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আধুনিক বিশ্বে বিপদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব আমরা বলতে পারি না যে, পুরুষ এবং মহিলাদের মেলামেশা হলে বিপদের সম্ভাবনা কম।

অন্য একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস আছে, ধর্মীয় আইন শাস্ত্রবিদগণ এর উপর নির্ভর করেছেন। নবী করিম (দঃ) বলেছেন, প্রথম দৃষ্টি তোমার এবং দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার জন্যে ক্ষতিকর। এটা কি কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছে, বা কোন অবস্থান নিচ্ছে? কারো কারো মতে এটা একটি সিদ্ধান্ত। তাদের মতে নবীজী (দঃ) বলেছেন-একজন লোক কোন মহিলার দিকে কেবল একবার তাকাতে পারে দ্বিতীয়বার নিষিদ্ধ। অনেকে বলেন, প্রথমবারের অর্থ "যখন তোমার চোখ অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য মহিলার দিকে পতিত হয়, এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃতভাবে তাকানো হয়, কাজেই তা অনুমোদিত নয়। তা সত্ত্বেও অন্যান্যদের মতে, এ বক্তব্য কোন রুলিং নয় অথবা এ

কথা দ্বারা অবস্থাও সুস্পষ্ট হচ্ছে না। তারা বলেন, প্রথমবার তাকানো হল অনিচ্ছাকৃত, দ্বিতীয়বারের দৃষ্টি যৌন কামনা মিশ্রিত এবং এ জন্যে মহানবী (সঃ) দ্বিতীয়বারকে ক্ষতিকরবলেছেন।

আরেকটি হাদীস আছে। ফকিহগণ এ হাদীসটির উপর নির্ভর না করলেও এতে ভাল শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, নবী (দঃ) জিজ্ঞেস করেন, "মহিলাদের জন্য কোন জিনিসটা সর্বোত্তম?" এতে কেউ উত্তর দিল না। শিশু ইমাম হাসান (আঃ) বাড়ীতে যেয়ে তাঁর মা বিবি ফাতেমা (আঃ) কে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে ফাতেমা (আঃ) বললেন, "যে কোন মানুষকে দেখে না এবং কোন মানুষ তাকে দেখে না।" এটা শিক্ষা দেয়, একজন মহিলা কোন পুরুষদের দিকে তাকানোও বিপজ্জনক। এটা নিরাপদ ও ভালো যদি কোন মহিলা অ-মাহরাম পুরুষের সাথে সাক্ষাত না করে। ব্যাপারটা তাই। একজন মহিলার যাতে অসুবিধা কম হয় সে কথা বিবেচনা করে আমরা বৈধতা নিয়ে আলোচনা করছি, কোন্ কাজ অধিকতর নিরাপদ তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এটা যে অধিকতর নিরাপদ এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ' বিষয়ে আর একটি হাদীস আছে, "একটি দৃষ্টি হলো শয়তানের তীর।" এখানে দৃষ্টি বলতে লোলুপ দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে এবং প্রতিটি জিনিসের অবৈধ কাজ আছে এবং চোখের অবৈধ কাজ হলো যৌণ কামনা নিয়ে তাকানো।" [৫] এখানেও দৃষ্টি বলতে লোলুপ দৃষ্টিকেই অথবা বিচ্যুতির ভীতিকে বুঝানো হয়েছে।

পাণি প্রার্থীর ব্যাপারে ব্যতিক্রম

বিবাহকালীন সময় সংক্রান্ত বহু হাদীস রয়েছে। যখন কোন লোক কোন মহিলার পাণিপ্রার্থী হয় তখন সে ঐ মহিলাকে দেখতে পারে। এ থেকে কি একথা বুঝা যায় না যে অন্য সময় দেখা জায়েজ নয়? বিয়ের সময় দেখাকে শুধু অনুমতি দেয়া হয়নি, এ ব্যাপারে জোরও দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। এক ব্যক্তি মদীনায় বসবাসকারী এক সাহাবীর কন্যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। মহানবী (সঃ) তাকে বলেন, 'প্রথমে গিয়ে দেখে এসো, তারপর বিয়ে কর। কেননা সেই সাহাবীদের চোখে কিছু অসুবিধা আছে।' মহানবী (সঃ) তাকে প্রথমে দেখে নিতে এজন্যে বলেন যে, সাহাবীরা ছিলেন দুয়েকটি কবিলাভুক্ত এবং তাদের অনেকেরই

চোখে এক ধরনের অসুখ ছিল। পরে যাতে হতাশ না হতে হয় সেজন্যে মহানবী (সঃ) তাকে দেখার পর বিয়ে করতে বলেন।

মুগিয়া ইবনে শো'বা বলেন, আমি বিয়ের চেষ্টা করছিলাম নবীজী (দঃ) বললেন, "তুমি কি তাকে দেখেছো?" আমি বললাম, না, আমি দেখিনি।" তিনি বললেন, "যাও এবং তাকে দেখ। কারণ এটা তোমাকে বিয়েতে মনোবল যোগাবে।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন, তোমাদের কেউ বিয়ের জন্যে কনে খোঁজ করলে প্রথমে বর হিসেবে পাত্রীকে দেখে নিবে। যখন একটি হাদীস বলে, এটা বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে জায়েজ, এর অর্থ কি এ নয় যে অন্যের জন্যে তা জায়েজ নয়? পাণিপ্রার্থীর জন্যে দেখা বলতে যদি শুধু মুখ ও হাত দেখা বুঝায় তাহলে বুঝতে হবে যৌন কামনা থাকবে না এবং এর অর্থ দাঁড়াবে, অন্য সময় দেখা বৈধ নয়। কিন্তু আসলে তা নয়। একজন বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষ তার প্রার্থিত মহিলার মুখ-চুল দেখতে পারে। এমনকি তার শরীরের বাহ্যিক কাঠামো এবং সেই সব জিনিসও দেখতে পারে যেগুলো মহিলাদের শারীরিক গঠনের উপর প্রভাব ফেলে। এ দেখা অনেক ব্যাপক এবং সুস্পষ্ট যে, পাণিপ্রার্থী যেভাবে দেখতে পারে অন্য সময় এভাবে কারো জন্যে দেখা বৈধ নয়। বলা হয়েছে, পাণিপ্রার্থী ঐকান্তিক হলে তার দৃষ্টিতে যৌন কামনা থাকলেও কোন অসুবিধানেই।

কোরআনে উল্লেখিত অন্যান্য ব্যতিক্রমসমূহ

এখন আমরা অন্যান্য ব্যতিক্রমগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। এর কতিপয় দিক হিজাবের সীমানার সাথে সম্পৃক্ত। আরেকটি ব্যতিক্রম বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে জড়িত। কিছু বিষয়ে কোন রকম দ্বিমত নেই, তবে কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তাদের সাজ সজ্জা যেন প্রদর্শন না করে-এ উক্তিটি দু'বার বলা হয়েছে এবং দু'বারই ব্যতিক্রমও সংযোজিত হয়েছে। প্রথমবার হিজাবের সীমানা ও যে যে সাজসজ্জা আবৃত করার প্রয়োজন নেই সে সব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার সে সব লোকদের কথা বলা হয়েছে। যাদের সামনে চুল, গ্রীবাদেশ, বক্ষদেশ সহ দেহে হিজাব পরিধানের আবশ্যকতা রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, "বহির্ভাগের সাজসজ্জা ছাড়া কোন সাজসজ্জা প্রদর্শন করা যাবে না," এটা আমি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। "তাদের বুকের উপর অবগুন্ঠন পরিধান করবে," আমরা এটাও ব্যাখ্যা করেছি। আবার

"——তাদের স্বামী ছাড়া আর কারোর সম্মুখে সাজসজ্জা প্রদর্শন করা যাবে না——," এ কথাটিরও ব্যাখ্যা করেছি। "স্বামীর সামনে কোন কিছুই আবৃত রাখার আবশ্যকতা নেই।" "তাদের পিতার সন্তান, এবং স্বামীর সন্তান, ভ্রাতা, ভাইয়ের সন্তান, বোনের সন্তানের সম্মুখে।" এ উক্তিটি সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে অধিকতর আরো চারটি সম্পর্কের কথা উল্লেখ আছে। সে গুলো দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা ব্যাখার জন্যে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে।

"অথবা তাদের নারীরা অথবা তাদের ক্রীতদাসীরা অথবা যৌনকামনাহীন পুরুষেরা যারা তাদের সেবা করে, অথবা সে সব শিশুরা যারা এখনো যৌন জ্ঞান অর্জন করেনি।" প্রশ্ন হল এখানে "তাদের নারীরা" বলতে কি সকল নারীদের বুঝানো হয়েছে, অথবা কেবলমাত্র মুসলিম নারীদের বুঝানো হয়েছে অথবা ঐ সব নারীদের বুঝানো হয়েছে যাদেরকে কেবল তাদের সেবার জন্য রাখা হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্নটি অস্বাভাবিক, উহার সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সকল নারীদের না বুঝিয়ে কেবল কাজের মেয়েকে বুঝালে এর অর্থ হবে তারা ঐসব নারীদের সামনে নিজেদের আবৃত রাখাবে যারা তাদের গোলাম নয়। স্পষ্টভাবে উহা এরূপ নয়। এটা ইসলামের প্রারম্ভিককাল থেকে সুস্পষ্ট একজন নারী অন্য আরেকজন নারীর কাছে মাহরাম। কাজেই এমন কোন নারী নেই, যে নারী অন্য নারীর জন্য মাহরাম নয়। তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি বিবেচনার যোগ্য, যেখানে মুসলিম নারীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা অমুসলিম নারীরা মুসলিম নারীদের জন্য মাহরাম নয়।

অবশ্যই এটা এমন একটা বিষয় যার জন্য অনেকে ধর্মীয় ফতোয়া উপস্থাপন করেছেন। তবে তা এভাবে নয়। অনেকের মতে একজন অমুসলিম রমণীর সামনে একজন মুসলিম রমণীর নগ্ন হওয়া হারাম। এর পেছনে যে যুক্তি দাঁড় করানো হয় তা হলো একজন রমণীর স্বামীর কাছে আর একজন রমণীর দেহবল্লরীর বর্ণনা দেওয়ার অনুমোদন নেই তথা এটা বর্জনীয়। মুসলিম রমণীরা এই বিধিনিষেধ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পালন করেন। তাই একজন মুসলিম রমণীর সামনে আর একজন মুসলিম রমণীর অনাবৃত হওয়ার অনুমোদন আছে। তবে একজন অমুসলিম রমণীর সামনে একজন মুসলিম রমণীর নগ্ন হওয়া জায়েজ নয়। কেননা এমনও হতে পারে যে, উক্ত অমুসলিম রমণী তার স্বামীর কাছে উক্ত মুসলিম রমণীর দেহবল্লরীর বর্ণনাও দিতে পারেন। যাইহোক, এটা সমার্থনযোগ্য নয়। তবে এটা বলা কঠিন যে এটা না জায়েজ কি না। কেননা কোরআনের আয়াতটিতেও সরাসরি "মুসলিম রমণীরা" কথাটি বলা হয়নি। অথবা এটা বলা আরো কঠিন যে, তাদের নারীরা কথাটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে।

এখানে দুটো সম্ভাবনা আছে। একটি হলো এটা দ্বারা সাবালিকা ক্রীতদাসীদের বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ ক্রীতদাসীদের সামনে মহিলা মনিবদের অনাবৃত হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধানিষেধ নেই অথবা এমনকি তাদের সাবালক ক্রীতদাসদের সামনেও। এ থেকে বুঝা যায় যে, একজন সাবালক ক্রীতদাস তার মহিলা মনিবের জন্য মাহরাম। এ বিষয়কে অদ্ভুত মনে করা অনুচিত হবে। যদি এটাকে অদ্ভুত মনে হয় তবে এর চাইতেও অদ্ভুত বিষয় হলো যে, উহা সাবালিকা ক্রীতদাসীদের জন্য চূড়ান্ত বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ একজন সাবালিকা ক্রীতদাসী তার পুরুষ মনিব বা অন্য কারো সামনেও মাথায় অবগুণ্ঠন পরার কোন দরকার নেই।

এখানে কোরআনের আয়াতটি একজন মহিলা মনিব ও তার সাবালক ক্রীতদাসদের কথা বুঝিয়েছে। যদি কোন মহিলা মনিবের সাবালক ক্রীতদাস থাকে তবে ক্রীতদাসটি তার জন্য মাহরাম না গায়ের মাহরাম? এটা হলো সেইসব ক্ষেত্রের মত যেখানে আয়াতটির বাহ্যিক প্রকাশ ও অন্যান্য প্রচলিত রেওয়ায়ত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সাবালিকা ক্রীতদাসীদের মাথায় অবগুণ্ঠন পরা বাধ্যতামূলক নয়। আর এক্ষেত্রে শরীয়তে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা নেই। আমরা আয়াতটিকে "বাহ্যিক প্রকাশ" এজন্য বলছি যে, এতে আদৌ সাবালিকা ক্রীতদাসীদের কথা বলা হয়েছে কিনা তা বলা খুবই কঠিন। তাহলে নিজের সাবালিকা ক্রীতদাসী এবং স্বামীর সাবালিকা ক্রীতদাসী কিংবা অন্যান্যদের সাবালিকা ক্রীতদাসীদের সম্পর্কে কি অভিমত? আর যারা ক্রীতদাসী নয় তাদের সম্পর্কেই বা কি অভিমত? উত্তরে বলা যেতে পারে, এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট কথা নেই। তবে আমরা বলতে পারি যে, "তাদের রমণীগণ" কথাটিতে ক্রীতদাসী ভিন্ন অন্যান্য রমণীরাও অন্তর্ভুক্ত। যদি আমরা ধরি যে, এটা অক্রীতদাসী তথা মুক্ত রমণীদের সাথে সম্পর্কিত তাহলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে মহিলা মনিবদের জন্য কেবল তাদের নিজেদের সাবালিকা ক্রীতদাসীরাই মাহরাম।

দেখা যাক কথাটি কতদূর গড়ায়। সাবালক ক্রীতদাসীরা তাদের পুরুষ মনিবদের জন্য মাহরাম। কিন্তু একজন অ-ক্রীতদাসী মুক্ত রমণীও উল্লেখিত সাবালিকা ক্রীতদাসীদের সামনে নিজেকে আবৃত রাখবে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে এটা এরূপ নয়। আয়াতটি সাবালক ক্রীতদাস ও সাবালিকা ক্রীতদাসী-এই উভয়কেই বুঝিয়েছে। যুক্তি এখন খুবই পরিষ্কার। যেহেতু সাবালকা ক্রীতদাসরা গৃহাভ্যন্তরে কাজ করে এবং তাদের সামনে ঐ সময় আবৃত থাকাটা অসুবিধাজনক, তাই তারা মাহরাম।

"অথবা ঐসব পরিচর্যাকারীরা যাদের কোন যৌনবাসনা নেই"-বলতে সেসব পুরুষদের বুঝানো হয়েছে যাদের যৌন ক্ষমতা নেই এবং যারা নারীদের প্রতি আকর্ষণ

অনুভব করে না। এরা মানসিক প্রতিবন্ধিদের মত যাদের এ ব্যাপারে ধারণা নেই। অবশ্য ব্যাখ্যাকারীরা আর একটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তাদের মতে এরা হলো ঐ সব ব্যক্তি যাদের কোন যৌন তাগিদ নেই। খোজারাও এদের অন্তর্ভুক্ত। এবং এরা মাহরাম। এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন রেওয়ায়ত আছে। সে মতে এসব ব্যক্তিদের হারেমে প্রবেশাধিকার ছিল এবং তাদের যৌন কামনা-বাসনা না থাকার কারণে তাদের রমণী হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

অনেকের মতে এদের মধ্যে দারিদ্র্যপীড়িত জনেরাও পড়ে। যারা বলে, এ দ্বারা মানসিক প্রতিবন্ধী ও অসুস্থদের বুঝানো হয়েছে, তাদের মতে এর কারণ হল, তাদের যৌন জ্ঞানের অভাব এবং তারা রমণীদের সম্মোহনী শক্তি সম্পর্কে অবচেতন। তারা শিশুর মতই অনভিজ্ঞ। তারা খোজাদেরও এদের মধ্যে সামিল করেন। বস্তুতঃ নিষ্কাম ব্যক্তিদের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর যাদের মতে এরা হলো দারিদ্র্যপীড়িত জনেরা, তারাও নিষ্কাম ব্যক্তিদের উপরই গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের মতে এসব ব্যক্তিরা খোজাসদৃশ, আর যদি তা নাও হয় তাহলে তাদের অবস্থা এরূপ যে তারা যৌনচাহিদার কথা ভুলে গেছে। অবশ্যই দ্বিতীয় মতামতটির গ্রহণযোগ্যতার সম্ভাবনা খুবই কম। এখানে এটা পরিষ্কার যে, মানসিক প্রতিবন্ধী বলতে এখানে তাদের বুঝানো হয়েছে, যাদের ভাল-মন্দ প্রভেদ করার ক্ষমতা নেই। মোদ্দা কথা হলো- যারা খোজাসদৃশ তারাই এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিবেচনার যোগ্য।

"অথবা শিশুরা যারা এখন পর্যন্ত রমণীদের গোপনাঙ্গসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেনি।" এখানে কি সাত বা আট কিংবা দশ বছরের শিশুদের কথা বলা হয়েছে? অথবা এসব শিশুদের কথা বলা হয়েছে যাদের এখনো যৌবনারম্ভ হয়নি? ধর্মবিশারদদের মতে দ্বিতীয়টি গ্রহণযোগ্য। শরীয়তও এভাবেই বিধান দিয়েছে। যৌবনারম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তারা 'মাহরাম', কিন্তু যৌবনারম্ভের পর থেকে তারা আর মাহরাম থাকে না।

২৪ ঃ ৩১ আয়াতের সিদ্ধান্ত

"তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পা না ফেলে।"

আরব রমণীরা সজোরে পদচালনা করতো যাতে করে তাদের ঝুমুরগুলো শব্দ করে এবং লুক্কায়িত গয়নাগুলো নজরে আসে। এখানে তাদের এরূপ করতে নিষেধ করা

হয়েছে এবং তা করতেও বারণ করা হয়েছে যা দ্বারা পরপুরুষেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনাত্মীয় পুরুষদের সাথে অমাহরাম রমণীদের সম্পর্ক স্থাপন একইভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা রমণীদের চলনে, বলনে, কথনে, অলংকারাদি পরিধানে প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা উদাহরণস্বরূপ কাজলের কথা উল্লেখ করেছি। এ হল একটি ব্যতিক্রম। কিন্তু তা রমণীর প্রতি কোন পরপুরুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করার মত বেশী হওয়া উচিত নয়। সবাই মহান স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবে,----- এটা খোদার একটি আদেশ। আল্লাহকে স্মরণ করুন। তিনি অভিপ্রায়গুলো সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত। যদি আমরা ব্যতিক্রমগুলোর কথা বিবেচনা করি তবে সেগুলো তাদের অভিপ্রায়ের পবিত্রতার উপর নির্ভরশীল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের টীকাঃ

১· "ওয়াসাইল", তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৪

২· "ওয়াসাইল", তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৯

৩· কেউ হয়ত এ বক্তব্যকে খন্ডন করার জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি পেশ করতে পারেন; বলতে পারেন, চুল ও মুখের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে যার কারণে একটি ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক এবং অপরটি বাধ্যতামূলক নয়? আমাদের যুক্তি হচ্ছে মুসলমানদের প্রথা এবং অন্যদের যুক্তি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক। যে ব্যক্তি প্রথা ও রীতিনীতির উল্লেখ করছে সে অন্যান্যদের যুক্তিকে খন্ডন করার ক্ষমতা রাখে–তার উল্লেখিত রীতি শুধুমাত্র একটি সম্ভাবনাময় দিক হলেও কথাটা সত্য। যদি তা বাস্তবসম্মত হত তাহলে ইসলামের পক্ষ থেকে এর ব্যাখ্যা দেয়া হত। ইসলাম মানুষকে অসুবিধায় ফেলতে চায় না।

৪· "ওয়াসাইল", তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৪

৫· "কাফী", পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৫ এবং "ওয়াসাইল", তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২৪

৬· "শাহী মুসলিম", চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ১৪২

৭· "জামে তিরমিজি", পৃঃ ১৭৫

৮· "ওয়াফী", বার খন্ড, পৃঃ ৫৮, "ওয়াসাইল", তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১১

"কাফী", পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৩৬৫

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামী হিজাব পঞ্চম অংশ

অনুমতি প্রার্থনার তিনটি সময়

"হে বিশ্ববাসীগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়োপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর তখন এবং এশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদেরকে একে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বৃদ্ধ নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে, তবে এটা হতে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশ্রোতা।" [১] (২৪ঃ৫৮-৬০)

এ তিনটি আয়াত দুটি অথবা তিনটি ব্যতিক্রম অবস্থার কথা প্রকাশ করে। একটি ব্যতিক্রম প্রথম আয়াতে রয়েছে যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেখানেই বলা হয়েছে "যদি তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তাহলে বল সালাম ----"কোন ব্যক্তিরই অপর কোন ব্যক্তির গৃহে প্রথমে তার আগমন ঘোষণা না করে এবং অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করার অধিকার নেই। এমনকি কোন শিশুরও তার মা কিংবা বোনের গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করার অধিকার নেই। একমাত্র স্বামীর জন্যেই গৃহে আগমনের ঘোষণা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। গৃহ হলো এমন এক স্থান যা একজন মহিলা তার নিজের বিশ্রাম বা অবকাশ যাপনস্থল বলে বিবেচনা করেন এবং তিনি সাধারণতঃ সেখানে এমনভাবে পোশাক পরিহিতা অবস্থায় থাকেন যে তিনি চান না যে একমাত্র তার স্বামী ছাড়া আর কোন ব্যক্তি তাকে এমতাবস্থায় দেখুক।

অতীতে ঘরের দরজা উন্মুক্ত রাখা হত এবং গৃহ কখনও আবাসস্থল বলে বিবেচিত হতো না। কামরাগুলোই একমাত্র আবাসস্থল বলে বিবেচিত হতো। বলা হয় তখন যে আইন–বিধান কামরার জন্য প্রযোজ্য হতো তা এখন গৃহের জন্য প্রযোজ্য। এখন দরজা বা বসতবাড়ী বন্ধ রাখাটাই হচ্ছে প্রথা। এমন কি যদি অন্য কারো দেখার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে একজন মহিলা তার গৃহের উঠোনটিকেও তার আবাসস্থল বলে বিবেচনা করতেপারে।

আমরা পূর্বেই এ বিধানটি উল্লেখ করেছি। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। চাই ছেলে তার মার বাড়ীতে যাক বা মেয়ে তার পিতৃগৃহে গমন করুক তাদেরকে অবশ্যই বাড়ীর যে অংশ আবাস বলে গণ্য তাতে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী আয়াতে সেই সব ব্যতিক্রম লোকদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যাদের সামনে মহিলাদের পর্দা করার প্রয়োজন নেই। বলা হয়েছে, যারা মাহরাম নয় তাদের সামনেই হিজাব ব্যবহার করতে হবে। তাদের পিতা""অথবা তাদের মেয়েলোক অথবা 'যারা তাদের অধিকারে' অথবা ছেলেমেয়ে""এরা ব্যতিক্রম। আমরা এরপর আলোচনা করেছি, 'যারা তাদের অধিকারে' বলতে কি শুধু পুরুষ দাস বুঝানো হয়েছে না ক্রীতদাসীরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, আয়াতের বাহ্যিক রূপ যারা ব্যতিক্রম তাদেরকেই ইঙ্গিত করে এবং রেওয়ায়তসমূহ বিশেষ করে শিয়া রেওয়ায়ত ও হাদীসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে তারা হচ্ছে "পুরুষ ক্রীতদাস।" কিন্তু অন্য সমস্যাটি হলো এই যে, ওলামায়ে কেরামের মাঝে সম্ভবত খুব স্বল্পসংখ্যক লোকেরাই ফতোয়া প্রদান করে বলেছেন যে, সাবালক ক্রীতদাসরা গৃহাভ্যন্তরে মাহরাম। অর্থাৎ হুকুমটি হচ্ছে তাদের সম্মুখে মহিলাদের দেহ আবৃত রাখার দরকার নেই। কারণ তাদেরকে এ আয়াতেগুলোতে (সাবালক ক্রীতদাসদেরকে) মাহরাম ধরা হয়েছে। কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থ স্পষ্ট এবং হাদীস ও রেওয়ায়তসমূহের ভাষ্যও ঠিক তদ্রুপ।

এ আয়াতগুলোতে 'অধিকারভুক্ত ও শিশুদের সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যতিক্রমের কথাও বলা হয়েছে। কারণ আমাদের ব্যতিক্রম রয়েছে এ ব্যাপারে যে মহিলাদের আবাসস্থলে তাদের স্বামী ছাড়া যে কোন ব্যক্তিকেই প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। এখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে পবিত্র কোরআন মজীদে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আরো দুটো দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দলটি হচ্ছে "অধিকারভূক্ত রয়েছে যারা" এবং দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে শিশুরা যারা বালেগ হয়নি।

কেউ যদি বলে বর্তমানে দাস-দাসীর কথা ভাবার দরকার নেই, কারণ দাস-দাসীর প্রথা এখন আর নেই, তাহলে এ কথা ঠিক নয়। না, আমরা এখানে একজন দাস-দাসীর কর্তব্য উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু দাস-দাসী সংক্রান্ত ইসলামী হুকুম আহকাম অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে এবং যদি কোন ব্যক্তি স্বয়ং এ আয়াতটি থেকে যুক্তি প্রদর্শন করতে চায় তাহলে সে দাস-দাসী ছাড়া অন্যদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার জন্য এ বিধানটি বর্ধিত করতে পারে।

আমরা উল্লেখ করেছি, এবং সে অনুসারে আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, অপর কোন ব্যক্তির গৃহে প্রথমে ঘোষণা না দিয়েই দাসগণ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুরা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না। উল্লেখিত তিনটি বিশেষ সময় ছাড়া এসব লোক একজন মহিলার আবাসে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা থেকে ব্যতিক্রম বলে বিবেচিতহবে।

উল্লেখিত তিনটি সময় হচ্ছে, এমন সময় বা মুহূর্ত যখন একজন মহিলা প্রায়শঃ নিজের সাধারণ পোশাক পরিহিতাবস্থায় থাকে না। উক্ত তিনটি সময়ের একটি হচ্ছে ফজরের নামাজের আগে যখন সে সদ্য ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছে এবং তখনো সে নিজেকে পুরোপুরি পোশাকে আবৃত করেনি। সেই সময়ে তাদের আগাম প্রবেশের বিন্দুমাত্র ঘোষণা না দিয়েই প্রবেশ করার কোন অধিকার নেই। অন্য আরেকটি সময় হচ্ছে দিবসের মধ্যাহ্নভাগ। যখন দিন থাকে অত্যন্ত গরম এবং যখন তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাদের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে তখন প্রবেশের জন্য অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে। তৃতীয় মুহূর্তটি হচ্ছে এশার নামাজের পর ঘুমাবার সময়।

কোন মহিলা সাধারণতঃ যখন তার কাপড়-চোপড় পরিত্যাগ করে সেই সময় এবং বিশ্রামের সময় ছাড়া অন্য সময়ে অনুমতি ছাড়াই এ সকল লোক প্রবেশ করতে পারে। এ আয়াতটি নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করে। আপনারা স্মরণ করুন, দু'সপ্তাহ আগে আমি স্বামী ছাড়া অন্যদের ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করেছি। সম্ভবতঃ সেখানে পিতাকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যিনি হচ্ছেন মাহরাম, অন্তর্ভূক্ত করা যায়মহিলার শ্বশুর এবং সম্ভবতঃ নিজ স্বামীর পুত্রকে যার জন্য দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন-মুখমণ্ডল ও হাত ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। ব্যাপার এ নয় যে অন্যান্য সময় এ সকল অংশ আকর্ষণীয় এবং কোন পুরুষের চোখ কোন নারীর দেহ অথবা তার মুখের উপর পড়লেই মারাত্মক কিছু হয়ে যায়। কিন্তু শরিয়তের এ সীমানা আর বাড়ানো হলে সমস্যা দেখা দিবে। আমরা বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

এখানে একটি বাক্য আছে যা নির্দেশ করে কেন এসব ব্যতিক্রম রয়েছে। কারণ তাদের কাজটাই হলো দৌড়াদৌড়ি করে একে অপরের কাছে যাওয়া। অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটি শিশু যে ঘরের ভেতর সব সময় চলাফেরা করছে সে যদি সবসময় অবিরত অনুমতি চাইতে থাকে তাহলে তা হবে অসহনীয়। তাই কেবলমাত্র বিশেষ মুহূর্তেই এইসব ব্যতিক্রম ব্যক্তিকে অনুমতি নিতে হয়।

আরেকটি বিষয় হলো, আয়াতটিতে যেসব অধিকারভুক্তদের কথা বলা হয়েছে, তারা কি দাস না দাসী? আমরা বলেছি তারা হচ্ছে পুরুষ দাস। এস্থলে আবার হাদীস ও রেওয়ায়তসমূহে এ কথাই বর্ণিত আছে। আল কাফীতে হযরত ইমাম সাদিক (আঃ) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 'সেখানে বলা হয়েছে, আয়াতের অর্থ হলো, পুরুষ দাসগণ কেবলমাত্র তিনটি লগ্ন বা মুহূর্ত ছাড়া অন্য সময়গুলোতে তাদের গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে না। এখানে দাসীরা নয়। কারণ রমণীরা তো রমণীদের নিকট মাহরাম।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো "এই তিন লগ্ন বা মুহূর্তে মহিলাদেরও কি কোন গৃহে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইতে হবে? তিনি বললেন, "না, তার দরকার নেই।"

অন্য আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে এক্ষেত্রে যদি দাসীদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে দাসদের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বলা যেতে পারে যে এ আয়াতটিতে পুরুষদেরকেই বোঝানো হয়েছে, মহিলাদেরকে নয়। কারণ এখানে ব্যবহৃত সর্বনামটি একমাত্র পুংলিঙ্গের জন্য প্রযোজ্য। এরা হচ্ছে মহিলাদের পুরুষ দাস। আমরা বলতে পারতাম সম্ভবতঃ কেবলমাত্র মহিলাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এখানে পুংলিঙ্গের বহুবচন দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ "যারা তোমাদের দাস তাদেরকে" উক্ত তিনটি মুহূর্ত ছাড়া অন্য সময় অনুমতি চাইতে হবে না। অতএব তারা (পুরুষ দাসেরা) স্পষ্টভাবে মাহরাম। কিন্তু এ দ্বারা কি অন্যরা বাদ পড়ে যায়? না, অন্য আয়াতে পুরুষ দাস ও অপ্রাপ্তবয়স্ক (নাবালেগ) শিশুদেরে মাহ্‌রাম বলা হয়েছে, এখানে তা একই রয়েছে। সে দু'টি এবং এ আয়াতটি হাদীস ও রেওয়ায়তসমূহ, বিশেষ করে শিয়া রেওয়ায়তসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথেই মিলে যায়। অবশ্য এগুলো ধর্মীয় ফতোয়াসমূহের সাথে খাপ খায় না।

চলুন আরো এগিয়ে যাই। যারা অন্যের দাসত্বাধীনে রয়েছে তাদের অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে না এবং ঐ সব ছেলেদেরকেও অনুমতির প্রয়োজন নেই যারা এখনও বালেগ হয়নি, কেবলমাত্র তিনটি সময় ছাড়া। এখানে পুংলিঙ্গ বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন অর্থে নয়। তাদের কাজ হচ্ছে একে অপরের খেদমত করার জন্য চলাফেরা করা। আর এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য তার নিদর্শনটি পরিষ্কার করে দেন। ------।

যখন তোমাদের সন্তানেরা বালেগ হবে তখন তাদেরকে অবশ্যই প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইতে হবে। এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য তার নির্দেশনাদি পরিষ্কার করেদেন।

যে দু'টি ব্যতিক্রম রয়েছে তার একটি হচ্ছে, পুরুষ দাসদের সম্পর্কিত এবং অন্যটি হচ্ছে শিশুদের সম্পর্কে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। তৃতীয় ব্যতিক্রমটি হচ্ছে, এমন সব মহিলারা যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে।

এমন সব মহিলারা যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে

পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে, মহিলারা শরীর ঢেকে রাখবে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না শুধুমাত্র বাহ্যিক দিক ছাড়া। বাহ্যিক দিক বলতে হাত ও মুখ বুঝানো হয়েছে।

পরবর্তী বাক্যে যেসব মহিলার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে তারা ব্যতীত মহিলাদেরকে নিজেদের ঘাড় স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে।

আমরা যদি এ আয়াতটিকে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে তুলনা করি তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে মেয়েদের দু'পাটি কাপড় বা পোশাক রয়েছে, একটি হচ্ছে ভেতরের ও অন্যটি হচ্ছে বাইরের। আগেকার আয়াতটির "যখন তোমরা তোমাদের বহির্বাস খুলে নাও" কথাটি আবারও এখানে বলা হয়েছে। অতএব একজন মহিলা তার বহির্বাস খুলে ফেলতে পারে। এরও পেছনে? অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ পোশাকও খুলে ফেলতে পারে? না, তা পারে না। তারা তাদের বাইরের পোশাক খুলে ফেলতে পারে। তবে তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

যদিও যাবতীয় ব্যতিক্রম বিদ্যমান তবুও এটা উত্তম যে একজন মহিলা নিজকে একজন পুরুষের নিকট প্রদর্শন করবে না। এটা উত্তম যে, একজন পুরুষও একজন মহিলার দিকে তাকাবে না। এসব ব্যতিক্রম হচ্ছে উদ্ভূত প্রয়োজনেরই তাগিদে। ইসলাম এমন ধর্ম নয় যে স্বীয় অনুসারীদেরকে দোষী করতে অথবা নিন্দাবাদ দিতে চায়। যখন কোন প্রয়োজন, আবশ্যকতা বা অসুবিধা থাকবে না তখন হিজাব পালন করাই উত্তম।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, মনে করুন কোন একটি ক্লাসে নারী ও পুরুষ উভয়েই উপস্থিত হতে চায়। এটি থেকে অবশ্য উভয়ই উপকৃত হওয়া দরকার। তবে তাদের একই শ্রেণীকক্ষে থাকার প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য আলাদা আলাদা কামরায় থাকা উত্তম। এখানে যে নারী একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছেছে তিনি হচ্ছেন এক ব্যতিক্রম। তবুও এটা উত্তম হবে যে, যদি (যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে) তারা তাদের বাহ্যিক পোশাক খুলে না নেয় এবং অন্যান্য মহিলাদের মত থাকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

নবী করীম (দঃ) এর স্ত্রীদের বিষয়

সূরা আহযাবের আরো দুটি আয়াত আমরা উল্লেখ করব এবং তারপর আমরা হিজাবের উপর আমাদের আলোচনার ইতি টানবো।

একটি আয়াত নবী করীম (দঃ)–এর পত্নীদের বিশেষত্বসমূহের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের পূর্বে প্রথানুসারে মানুষের বাড়ীতে কোন হিজাব ছিলো না। তখন পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা হতো। তখন লোকেরা কারও গৃহে প্রবেশের সময় তাদের আগমন ঘোষনায় অভ্যস্ত ছিল না। তারা নবী করীম (দঃ)–এর গৃহে কোন ঘোষণা না দিয়েই প্রবেশ করতো এবং তাঁর গৃহের সব ক'টি কামরার অভ্যন্তরে গমন করতো। যদি তাদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হতো তাহলে নবীগৃহ ত্যাগ করে চলে যেতে তারা দীর্ঘ সময় নিত। তারা তাদের পা প্রসারিত করে দীর্ঘ আলোচনায় রত হতো। এ ব্যাপারটি নবী করীম (দঃ)–কে বিরক্ত করেছিলো এবং তিনি তাদেরকে চলে যাওয়ার কথাটা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না। তখন ৩৩ঃ৫৩ আয়াতটি নাযিল হয়, "তোমরা তাঁর (রাসুলের) স্ত্রীদের নিকট কোন কিছু চাইলে পর্দার (হিজাবের) অন্তরাল থেকে তা চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তকরনের জন্য অধিকতর পবিত্র।[২] "

যখনই উলামায়ে কেরাম হিজাব প্রসঙ্গে কোন আয়াত উল্লেখ করেছেন, তখন তাঁরা এ আয়াতটিকেই বুঝিয়েছেন। আর 'হিজাব' শব্দটি নিজেই পর্দা বা আচ্ছাদনের অর্থ বহন করে। আমরা যখন বলি যে, মহিলাদের উচিত তাদের শরীরের বিশেষ বিশেষ অংগ ঢেকে রাখা, তখন হিজাব শব্দটি দ্বারা আমরা যে কথা বুঝাই তার সাথে এর কোন সংশ্রব নেই। অতএব আমাদের আলোচনার সাথেও এর কোন সম্পর্ক নেই এবং এটি ঐসব লোকদের প্রসঙ্গে যাদের বলা হয়েছে যে তাদের নবী করীম (দঃ)–এর গৃহে

প্রবেশের সময় ঘোষণা দিয়ে প্রবেশ করা উচিত এবং যদি তারা কিছু চায় তাহলে তাদেরকে পর্দার অন্তরাল থেকে তা চাওয়া উচিত।

হিজাব সংক্রান্ত আয়াত

এ সূরায় আরো একটি আয়াত রয়েছে যা আমাদের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিনদের নারীগণকে বলে দিন যে তারা যেন তাদের (বাহ্যিক পোশাক) জিলবাব নিজেদের দেহ আবৃত করার জন্য টেনে নেয়। এভাবে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল করে দিব' এরপর এ নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে। (৩) (৩৩ঃ৫৯–৬০)

সব মুফাস্‌সিরই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট ঘটনা মদীনায় সংঘটিত হয়েছিল যার সাথে এই আয়াতটি সংশ্লিষ্ট। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্নীতি পরায়ণদের একটি দল ছিল যারা সাধারণ জনতা এবং বিশেষত মহিলা ও অন্যান্যদেরকে বিরক্ত করতো। যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে কেন তোমরা এ কাজ করছ? তখন তারা বলতো ঃ 'আমরা ভেবেছিলাম এরা দাসী।"

দাসীরা হচ্ছে ব্যতিক্রমদের অন্তর্ভুক্ত। দাসীদের গায়র মাহরাম পুরুষদের থেকে নিজেদেরকে আবৃত করে রাখার প্রয়োজন নেই। যদিও তাদের জিলবাব থাকতো তথাপি মাথার চুল ঢাকার জন্য তারা তা ঠিক সেভাবে পরতো না। প্রায়শঃই মুসলিম মহিলারা (যারা দাসী নয়) রাতে হেঁটে চলার সময় এই লম্পট মুনাফিকদের দলটি তাদেরকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করতো। যখন তারা ধরা পড়তো তখন তারা অজুহাত দেখাতো যে তারা এসব মহিলাদেরকে দাসী বলে মনে করেছিলো।

এ আয়াতে মহিলাদের শরীর ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এভাবে তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। তখন লম্পট ও মুনাফিকরা তাদের বিরক্ত করতে পারবে না অথবা কমপক্ষে তাদের কোন অজুহাত থাকবে না যে তারা চিনতে পারেনি।

কিছু কিছু মুফাস্‌সির একটি ভিন্ন উপায়ে এ আয়াতটি ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেন, "এ আয়াতটি বোঝাচ্ছে মহিলারা সনাক্ত হবে যে তারা এ পথের নয়" (অর্থাৎ

তারা কেনা-বেচার জন্য নয়)। তারা বলছেন যে, যদি কোন মহিলা নিজের মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে চলে এবং নিজের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব পোষণ করে, তাহলে লম্পটেরাও তাকে সম্মান করবে। যদি তারা জানে যে, উক্ত মহিলা অন্যান্য মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে যদি সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ সহকারে চলাফেরা করে, তাহলে তারা আর তাকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করবে না।

অতএব এ আয়াতটি বিশেষ কতকগুলো ঘটনার দিকে নির্দেশ করে যা সংঘটিত হয়েছিল (এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদকে চিহ্নস্বরূপ বানানোর জন্য তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল যাতে তাদেরকে অন্যান্য দাসী মহিলাদের থেকে পৃথক করা যায়।) অতঃপর আয়াতটিতে যারা অন্যদেরকে বিরক্ত ও উত্যক্ত করে তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে যদি তারা (এ ঘৃণ্য কাজ থেকে) বিরত না হয় তাহলে "আমরা তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করবো।"

এখন আমরা দেখব যে দাসী মেয়েদের থেকে মুসলিম মহিলাদের আলাদা করে চেনার জন্য কোন কোন সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়াতটিতে এরশাদ হচ্ছে "তারা যেন তাদের জিলবাব তাদের দেহের উপর টেনে দেয়।" কিন্তু চাদরকে কতটুকু কাছে টেনে নিতে হবে? বলা হয়েছে, তাদের মস্তক অবশ্যই ঢেকে নিতে হবে। কেউ কেউ আরো এগিয়ে বলেন, তাদের চিবুকও ঢেকে ফেলতে হবে এবং এ চিহ্ন দিয়েই তাদেরকে দাসীদের থেকে আলাদা করা যাবে।

জিলবাব দেখতে যে কেমন ছিল তা সঠিকভাবে পরিষ্কার নয়। আরবী অভিধান আল মুনজিদে বলা হয়েছে যে জিলবাব হচ্ছে ঢিলা ঢালা পোশাক। যদি এটা পোশাকই হয়ে থাকে তবে এ আয়াতটি তাদের চুল ঢাকার জন্য নির্দেশ দিতো না।

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী আল-মুফরাদাহ নামক গ্রন্থে (এ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি শব্দকোষ বা অভিধান এবং এতে ভালোভাবে পবিত্র কোরআন মজিদের শব্দসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে) বলেন যে, "জিলবাব শব্দের অর্থ হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছদ এবং স্কার্ফ।

যেসব মহিলা একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পার হয়ে গেছেন তাদের সম্পর্কে ইমাম রেজা (আঃ) থেকে এক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে জিলবাব হচ্ছে এমন কিছু যা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা হয়। তিনি বলেছেন, তারা জিলবাব সরিয়ে রাখাতে পারে। কেননা কোন বৃদ্ধা মহিলার চুলের দিকে যদি কেউ

তাকায় তাহ'লে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। এখানে জিলবাব দ্বারা চুল ঢাকা যায় না, মাথা ঢাকা যায় তা পরিষ্কার নয়।

অপর আরেক রেওয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিলবাব খামুর থেকে স্বতন্ত্র। তবে পার্থক্যটা পরিষ্কার নয়। সম্ভবতঃ এটা আরো বড় হতে পারে। ইমাম সাদেক (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এসব মহিলারা কি কি পোশাক খুলে রাখতে পারে? তিনি বললেন, "তাদের জিলবাব ও খামুর", অর্থাৎ তাদের বহির্বাস এবং স্কার্ফ।

আরো দুটি বিষয়ে এ আয়াত থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে এ আয়াতটি সূরা নূরের আয়াতটির সাথে আর কোন কিছুর সংযোজন করে না, কেন? কারণ আয়াতটি বিশেষ কতিপয় ঘটনার দিকে নির্দেশ করে যা তখন ঘটছিলো, তবে সর্বকালের জন্য সার্বিক আইনের দিকে নয় এবং দ্বিতীয়তঃ আয়াতটিতে কেবলমাত্র তাদের নিজেদের জিলবাব আরো সন্নিকটে টেনে নেয়ার কথাটাই বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের টীকাঃ

১. কোরআন ২৪ঃ৫৮

২. কোরআন ৩৩ঃ৫৩

৩. কোরআন ৩৯ঃ৫৯-৬০

উপসংহার

সভা ও সমাবেশে মহিলাদের অংশগ্রহণ

উপরের আলোচনায় যে সকল কথা বলা হয়েছে এতে দেখা যায় ইসলাম নারী ও পুরুষের বৈধ যৌন সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও এর অসাধারণ মূল্য সম্পর্কে সচেতন এবং এ ব্যাপারে ইসলাম নীরব নয়। নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করা, একে অন্যের কথা শোনা এবং একত্রে বসবাস করা-- সকল বিষয়কেই ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। এ সকল ব্যাপারে সামান্যতম ক্ষতিকেও ইসলামী বিধান সমর্থন করে না। কিন্তু আজকের বিশ্ব এই অসাধারণ মানবিক মূল্যবোধকে অবহেলা করছে এবং সচেতনভাবে এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করার নীতি গ্রহণ করেছে।

বর্তমান বিশ্ব নারী জাতির স্বাধীনতার নামে, আরো সরাসরি বলতে গেলে যৌন স্বাধীনতার নামে শুধুমাত্র যুব সমাজের চরিত্র নষ্ট করার কাজই করে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বিস্ময়কর সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে এ স্বাধীনতা মানবিক শক্তি ও প্রতিভাকে এমনভাবে বিনষ্ট করছে যে অতীতে কখনো এরূপ দেখা যায়নি।

নারীরা তাদের গৃহ-বসত-বাড়ী ত্যাগ করেছে। কিন্তু তা কিসের জন্য? সিনেমা, সমুদ্র সৈকত, রাস্তা এবং সান্ধ্যকালীন আপ্যায়নের তাগিদে। আজকের নারী সমাজ স্বাধীনতার নামে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থলে যেমন ঠিক মত কাজ করতে পারছে না, সাথে সাথে নিজেদের ঘর-বাড়ীও ধ্বংস করে দিয়েছে।

এই বল্গাহীনতা ও অবাধ স্বাধীনতার ফলে যুব সমাজের শিক্ষাগত দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে। তরুণরা বিদ্যালয় ও শিক্ষা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং যৌন অপরাধ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলচ্চিত্র-বাজার এখন চুটিয়ে ব্যবসা করছে এবং প্রসাধনীর ব্যবসায় লিপ্ত পুঁজিপতিদের পকেট বর্তমানে মুনাফার ভারে উপচে পড়ছে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যৌন শালীনতার বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট বিপদাপদ সত্ত্বেও খোদাপ্রদত্ত ধর্মীয় বিধি-বিধানের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাদের ধারনা দেয়া হয়নি। এসব বিধি-বিধান মুসলিম উম্মাহকে যে কোন ধরণের চরম পন্থা থেকে বিরত রেখে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে পরিচালিত করে। ইসলামী বিধান নারী সমাজকে দুর্নীতি থেকে যেমন মুক্ত রাখতে চায় তেমনি তাদেরকে সামাজিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে বাধা দেয়নি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে ওয়াজিবও করেছে।

যেমন হজ্জের আচার-অনুষ্ঠানসমূহ নারী-পুরুষ সকলের উপর সমানভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোন স্বামীরই এতে বাঁধা দান করার অধিকার নেই।

আমরা জানি, কোন শহর বা মুসলিম অধ্যুষিত কোন এলাকা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং জেহাদ পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক না হওয়া পর্যন্ত মহিলাদের জেহাদে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে অবশ্য ধর্মীয় ফেকাহবিদদের ফতোয়া অনুযায়ী নারীদের উপরও জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও নবী করীম (দঃ) সৈন্য ও আহতদের সাহায্য করার জন্য কতিপয় মহিলাদেরকে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এতদসংক্রান্ত বহু কাহিনী রয়েছে। (২)

জামায়াতের সাথে ফরজ নামাযসমূহে অংশগ্রহণ করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব নয়। তবে যদি মহিলারা মসজিদে গমন করে, তাহলে নামাযের জামায়াতে অংশগ্রহন করা এবং তা তরক না করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। (৩)

ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করা মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয়, তবে অংশগ্রহণ করা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়নি। তবে এসব নামাযসমূহে অত্যন্ত সম্মানিতা ও খুব সুন্দরী মহিলাদের অংশগ্রহণ করা অনুমোদিত নয়। (৪)

নবী করীম (দঃ) নিজের স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করে তাদেরকে নিজের সাথে ভ্রমণের জন্য নিয়ে যেতেন এবং কতিপয় সাহাবীও নিজেদের স্ত্রীদেরকে অনুরূপভাবে সাথে নিতেন। (৫)

নবী করীম (দঃ) মহিলাদের বায়আত গ্রহণ করতেন। তবে তিনি তাদের সাথে করমর্দন করতেন না। তিনি এক গামলা পানি আনতে আদেশ দিতেন। তিনি পানিতে হাত ডুবাতেন এবং বায়আতকারিণী মহিলাকেও অনুরূপ করতে আদেশ দিতেন। অতঃপর উক্ত মহিলাকে বিবেচনা করা হত যে তিনি বায়আত করেছেন। (৬)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (দঃ) তার জীবদ্দশায় কোন গায়র মাহরাম মহিলার হাত স্পর্শ করেননি।

তিনি মহিলাদেরকে দাফন অনুষ্ঠানে শরীক হতে বারণ করেননি। যদিও তিনি এ বিষয়টিকে জরুরী বলে অনুভব করেননি। তিনি পছন্দ করতেন যে, তারা যেন অংশগ্রহণ না করে। যদিও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তারা অংশগ্রহণ করতেন এবং হয়ত তারা দৈনন্দিন নামাযসমূহের কেরাআতেও শরীক হতেন। আমাদের রেওয়াত ও

হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (দঃ) এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত যয়নব যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন হযরত ফাতেমা জাহরা (আঃ) ও অন্যান্য মুসলিম মহিলারা এসে তার জন্য জানাযার নামায পড়েন।৭

শিয়া রেওয়াত ও হাদীসসমূহ অনুসারে যুবতী মেয়েদেরকে ফজরের নামাযে শরীক হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। সুন্নী উলামারা উম্ম-ই আতীয়াহ থেকে রেওয়াত করেছেন, তিনি বলেন, "নবী করীম (দঃ) মহিলাদেরকে জানাজার নামাযে শরীক না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তবে তিনি তা নিষিদ্ধও করেননি। (৮)

নবী করীম (দঃ) এর নিকট গমন করে মদীনাবাসী মহিলাদের সমস্যার কথা ব্যক্ত করার জন্য আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারী মদীনার মহিলাগণ কর্তৃক তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলেন। আসমা সে দায়িত্ব গ্রহণও করলেন। যখন আসমা প্রবেশ করেন তখন নবী করীম (দঃ) একদল সাহাবীদের মাঝে বসে ছিলেন। আসমা বললেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন। আমি মদীনার মহিলাদের তরফ থেকে আপনার নিকট প্রতিনিধি। আমরা মহিলারা বলছি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক আপনাকে পুরুষ ও নারীজাতি উভয়ের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আপনি কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য রাসূল নন। আমরা মহিলারাও আপনার উপর ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা মহিলারা আমাদের বাড়ীতে পুরুষদের যৌন চাহিদা মিটাতে বসে থাকি। আমরা আপনাদের সন্তানদেরকে আমাদের উদরে ধারণ করি। তুবও আমরা দেখি যে, যাবতীয় পবিত্র দায়িত্ব, বড় ও মূল্যবান কাজকর্মাদির পুরস্কার আল্লাহপাক দেবেন কেবলমাত্র পুরুষদেরকেই, আর আমরা তা থেকে বঞ্চিত রয়েছি। পুরুষদেরকে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তারা রোগীদেরকে দেখতে যেতে পারে, তারা জানাযার মিছিলে শরীক হতে পারে, তারা বারবার হজ্জব্রত পালন করতে পারে এবং সর্বোপরি তাদেরকে আল্লাহর রাহে জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অথচ যখন কোন পুরুষ ব্যক্তি হজ্জ বা জিহাদে গমন করে তখন আমরা মহিলারাই তার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করি। তার পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য আমরা কাপড় বুনন করি। আমরা তার সন্তানদের প্রতিপালন করি। তাহ'লে এটা কিভাবে হতে পারে যে আমরা কঠিন বিষয়াদির ক্ষেত্রে আপনাদের পুরুষদের সমান অংশীদার অথচ যখন পবিত্র দায়িত্ব ও কাজকর্ম আসে যার আধ্যাত্মিক প্রতিদান বা পুরস্কার আল্লাহপাক দেবেন তখন আমরা অংশীদার নই এবং আমাদেরকে সেগুলোর সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হয়?

নবী করীম (দঃ) সাহাবা-ই-কিরামের দিকে তাকালেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি কখনও কোন মহিলাকে উক্ত বিষয়সমূহের উপর এত উত্তমভাবে, এত যুক্তি সংগতভাবে এবং এত পরিষ্কারভাবে কথা বলতে শুনেছো?"

একজন সাহাবী বললেন, "এসব কথা এ মহিলার নিজের বলে আমি মনে করি না"

নবী করীম (দঃ) সাহাবীরা কি বললেন সেদিকে মনোযোগ না দিয়েই আসমার দিকে ফিরে বললেন, "হে মহিলা, তুমি যা বলছো তা বোঝার চেষ্টা কর এবং যেসব মহিলা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের কাছে গিয়ে ব্যাখ্যা করো। তুমি কি মনে কর যে এসব কাজ করার জন্য পুরুষই শুধু আধ্যাত্মিক পুরস্কার ও পুণ্য অর্জন করবে এবং মহিলাদেরকে বঞ্চিত করা হবে? না, এরকম নয়। যদি কোন নারী তার পরিবার ও স্বামীর যত্ন নেয় এবং জাহিলিয়াতের ধূলায় তার গৃহের বিশুদ্ধ পরিবেশকে দুষিত হতে না দেয়, তবে সে অবশ্যই পুরুষেরা যেসব আমল করে সেগুলোর সবকটির সমতুল্য আধ্যাত্মিক পুরস্কার, পুণ্য ও সফলতা লাভ করবে।"

আস্‌মা ছিলেন ঈমানদার মহিলা। তার আবেদন এবং যেসব মহিলা তার মত চিন্তা করত তাদের আবেদন তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের গভীরতা থেকে উৎসারিত হয়েছিল, লোভ-লালসা থেকে নয়, যা আমরা আজ প্রায়শঃ দেখে থাকি। আসমা ও যেসব মহিলা তাকে পাঠিয়েছিল তারা উদ্বিগ্ন ছিল যে তারা যেসব দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকে সম্ভবতঃ সেগুলোর কোন মূল্য নেই এবং যাবতীয় পবিত্র দায়িত্ব সবই পুরুষদেরকেই দেয়া হয়েছে। তিনি ও যেসব মহিলাদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করলেন তারা সকলেই সাম্য চাচ্ছিলেন। তবে তা কিসে? তাহলো খোদায়ী আদেশ ও ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালন করার ক্ষেত্রে। কখনো তাদের অন্তঃকরণসমূহে, অধিকারের নামে নিজস্ব অহংবোধ প্রসূত আশা-আকাংখা প্রবেশ করেনি। অতএব যখন তিনি নবী করীম (দঃ) এর উত্তর শুনলেন তখন তার মুখমন্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল এবং তিনি তাঁর বান্ধবীদের নিকট সুখী মনে প্রত্যাবর্তন করলেন।[৯]

এসব বিষয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়তসমূহে একটির সাথে আরেকটির বিরোধ রয়েছে। কতিপয় হাদীসে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। তবে ওয়াসায়িলের রচয়িতা, যিনি নিজেই ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য হাদীসবর্ণনাকারী, তিনি হাদীস ও রেওয়ায়তসমূহের সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেছেন, "ইসলামী হাদীস ও রেওয়ায়তসমূহের সার্বিক দিক বিচারে

মন্তব্য করা যায় যে, যানাজা নামাযে অংশগ্রহণ করা বা জনগণের অধিকার তদারক করতে যাওয়া[১০], কিংবা জানাযার মিছিলে শরীক হওয়া বা এসব জমায়েতে অংশগ্রহণ করার জন্য মহিলাদের গৃহত্যাগ করা জায়েজ আছে। যেমন হযরত ফাতেমা (আঃ) এবং মাসুম ইমামদের পত্নীগণ এ ধরনের অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করতেন। অতএব হাদীস ও রেওয়ায়তসমূহের সার্বিক দিক প্রমাণ করে যে, যেসব রেওয়ায়তে নিষেধাজ্ঞা আছে তা আমরা উপেক্ষা করতে পারি। [১১]

নবী করীম (দঃ) তার পত্নীদেরকে তাদের যেসব প্রয়োজন রয়েছে তা মেটানোর জন্য এবং তাদের করণীয় কাজ করার জন্য গৃহত্যাগের অনুমতি দিতেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে নবী করীম (দঃ) মেয়েদের জন্য মসজিদে প্রবেশের দরজা পুরুষদের জন্য মসজিদে প্রবেশের দরজা থেকে আলাদা করে দেবার জন্য আদেশ দেন, যাতে করে পুরুষ ও মহিলারা একই দরজা দিয়ে আসা যাওয়া করতে বাধ্য না হয়। তিনি পুরুষদেরকে মহিলাদের ব্যবহৃত দরজা ব্যবহার করতে বারণ করেন। [১২]

হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (দঃ) আদেশ দেন যে এশার নামাযের পর মেয়েরা প্রথমে মসজিদ থেকে বের হবে, যাতে করে পুরুষ ও মহিলারা মিলেমিশে যেতে না হয়। [১৩]

সংসর্গ এড়ানোর জন্য তিনি নির্দেশ দেন যে, মহিলারা রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে এবং পুরুষেরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করবে।

এ কারণেই মুসলিম ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ ফতোয়া প্রদান করেন যে, পুরুষ ও মহিলাদের একত্রে মেলামেশা করার অনুমোদন নেই। আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ কাযিম তাবাতাবাঈ ইয়াযদী লেখেছেন, ''আসলে যদি কোন ব্যক্তি মুক্ত মন নিয়ে ইসলামের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে মধ্যম পথ।[১৪] ইসলাম একদিকে যৌন সম্পর্কের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করতে বড় ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করেছে ঠিক তেমনি নারী জাতির মানবীয় মেধাসমূহ বিকশিত হওয়ার পথকে কোন ভাবেই বাধাগ্রস্থ করেনি। এসব বিধি বিধান মনকে সুস্থ রাখার জন্য এবং পারিবারিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতর এবং গভীরতর করার জন্য এবং পুরুষ ও মহিলাদেরকে যে কোন ধরনের অসুস্থ চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে রাখার একটি সুস্থ ভারসাম্যমূলক সামাজিক পরিবেশের যোগ্য করে গড়ে তোলে।[১৫]

উপসংহারের টীকাঃ

১· মাসালিক, জেহাদ অধ্যায়

২· সহি মুসলিম, ৫ম খন্ড, পৃ ১৯৬–৯৭

সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃ ১৭

জামে তিরমিযি পৃ ২৪৭

৩· ওয়াসাইল, ১ম খন্ড, পৃ ৪৭৪

৪· ওয়াসাইল ১ম খন্ড, পৃ ৪৩৭

৬· সকল ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যাদাতা এটা উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ মক্কা বিজয়ের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে এবং মুফাসসিরগণ কোরআনের আয়াত, "হে নবী, যখন মুমিন মহিলারা তোমার কাছে বায়েত নিতে আসে----' (৬০ ঃ১২) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন। কাফী গ্রন্থের ৫ম খন্ড ৫২৬ পৃষ্ঠায়ও এটা উল্লেখিত হয়েছে।

৭ ওয়াসাইল ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৬

৮·· সহি মুসলিম ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭, বুখারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪, সুনান ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০

৯· আসাল আল ক্বাবা ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮–৩৯৯

১০· দেখুন বিহার আল আনওয়ার ১১ খণ্ড, পৃঃ ১১৮। সেখানে মুসা ইবনে জাফর (আঃ) বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত কাফি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমার পিতা ইমাম জাফর (আঃ) মদীনার গরীব লোকদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আমার মাতা ও তাঁর (ইমাম জাফরের) মাতাকে পাঠাতেন।

১১· ওয়াসাইল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২

১২· সুনান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯

১৩· কাফী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৯

১৪· সুনান ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৮

১৫· ওরওয়াতুল উসকা, ১ম অধ্যায়, সংখ্যা–৪৯